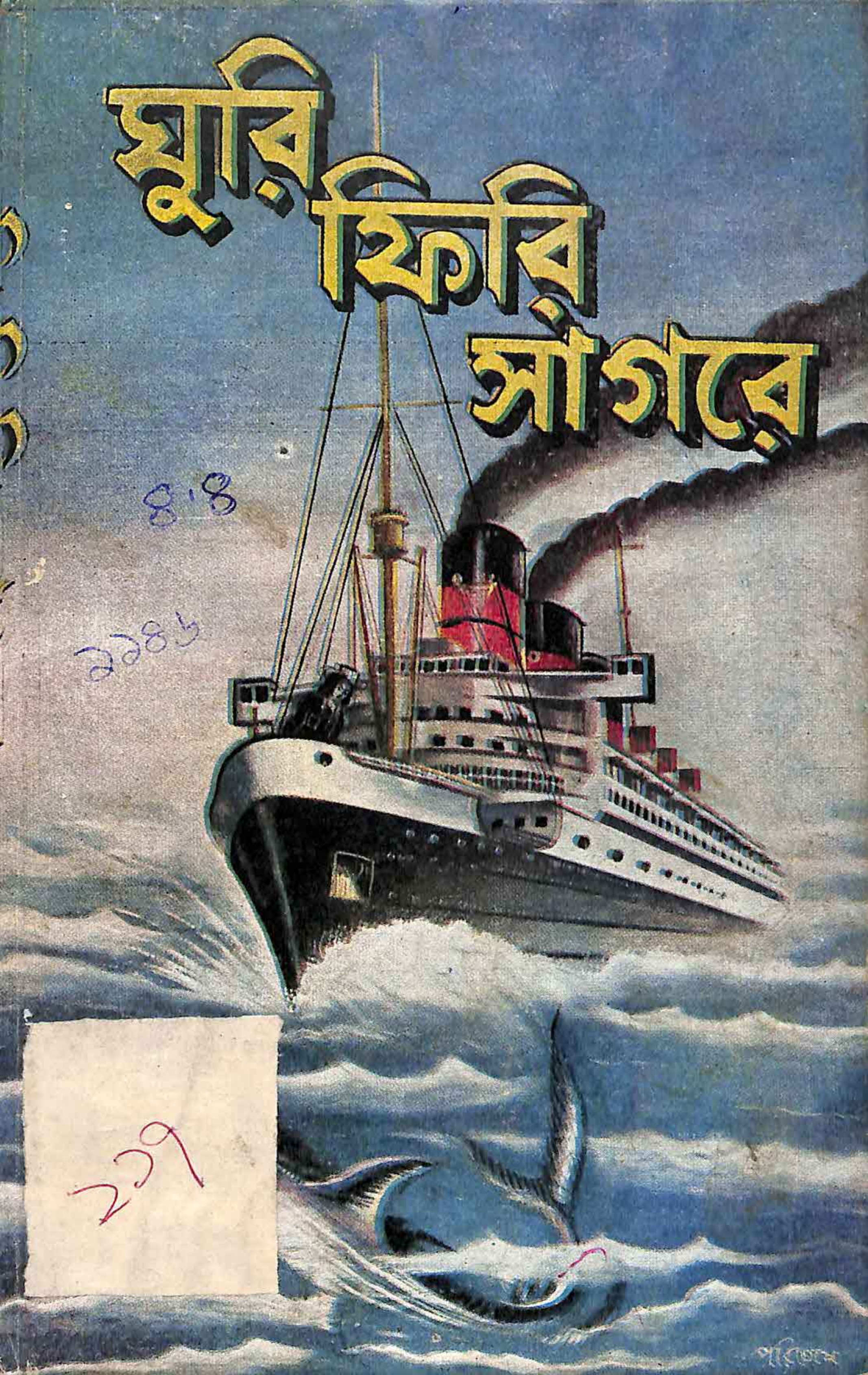

ঘুরি ফিরি সাগরে

ঘুরি ফিরি সাগরে

শ্রীসুরেশচন্দ্র সাহা

দীপালী বুক হাউস

১২/১ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক ঃ—
অধীর সরকার ও মানিক দত্ত
দীপালী বুক হাউস
১২/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ—
শ্রাবণ ১৩৯৪ ইং August 1987

মূল্য—বারো টাকা মাত্র।

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ পরিতোষ বাইন

ঋণ স্বীকার ঃ শ্রীগোপাল মুখার্জী
শ্রীসুখেন সাহা
শ্রীপ্রদীপ সাহা

মুদ্রণে—
শ্রীগণেশ কুমার ভাণ্ডারী
লক্ষ্মী প্রিণ্টার্স
২১/১ বি, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা—৯

প্রকাশকের নিবেদন

ঘুরি ফিরি সাগরে আসলে ছোটদের সমুদ্র ভ্রমণ। ছ' বছর বয়সী ওঙ্গা নামে একটি মেয়ের আপন সফরের কাহিনী। সত্যি কাহিনী।

ওঙ্গার বাবা 'রাজহংস' জাহাজের চিফ এঞ্জিনীয়ার। সেই সুবাদে বাবা মায়ের সঙ্গে ওঙ্গা কলকাতার ডকে জাহাজে গিয়ে ওঠে—শুরু হয় তার জীবনের এক অচিন্ত্যনীয় অধ্যায়। কলকাতার ডক থেকে জাহাজ ছাড়া, এবং গঙ্গা বক্ষে তার এগিয়ে চলার বিস্ময়, জাহাজ-ভাসা গঙ্গার অনেক অজানা কথা অন্য অনেকের মতো ওঙ্গাদের সামনেও একটি রহস্য রাজ্যের ছবি উন্মোচিত করে দেয় ; তখন সবার মনে হয় গঙ্গা যেন একটি নদী মাত্র নয়—তার একটি আশ্চর্য প্রাণ-শরীর রয়েছে।

কলকাতা থেকে গঙ্গা বেয়ে একশ সাতাশ মাইল দূরে গিয়ে ওঙ্গারা প্রথম বঙ্গোপসাগর ছাখে। সে কি বিস্ময় ! তারপর বাংলাদেশ হয়ে বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর, আরব সাগর পেরিয়ে এডেন ডাইনে ফেলে রাজহংস সৌদি আরবের জেড্ডা বন্দরে গিয়ে ভেড়ে। আমাদের দেশের সঙ্গে মরুভূমির দেশের পার্থক্য সবার চোখেই ধরা পড়ে।

জেড্ডার পর লোহিত সাগর। তারপর সুয়েজ খাল—ছয় বছরের মেয়ের পক্ষে সে কি বিস্ময় ! সুয়েজের পর ভূমধ্যসাগর, জিব্রালটার, আটলান্টিক। উত্তর সাগর পেরিয়ে পশ্চিম জার্মানী এবং ইংলণ্ডের বন্দরে বন্দরে গিয়ে রাজহংস ভেড়ে ; জাহাজে মাল ওঠানামা চলে। রাজহংস একটি মালবাহী জাহাজ, নিত্যনতুন দেশের সঙ্গে তার যোগসূত্র।

সমুদ্রের নানা বিস্ময়, চলমান জাহাজে নাবিকদের জীবনধারা বন্দরে বন্দরে মাল ওঠানামা ইত্যাদি পড়ে আমাদের মনে হয়েছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অপরিচিত এক জগতে আমরাও ওঙ্গার সঙ্গে পৌঁছে গিয়েছি। ছ' বছরের মেয়ের বিস্ময় নিয়ে সব প্রত্যক্ষ করছি।

পৃথিবী পর্যটক শ্রীসুরেশ সাহার ভাষায় সব রহস্যের রসময় ইতিকথা ছোট এবং বড়দের সমানভাবে আনন্দ দেবে, অভিভূত করার সেই বিশ্বাসেই আমাদের এই গ্রন্থপ্রকাশ।

—লেখকের নিবেদন—

রাজহংস জাহাজে উঠে ওঙ্গা নামে ছয় বছরের একটি মেয়ে সমুদ্র সফর করতে যায়—নদী, সমুদ্র এবং অনেকগুলি দেশ দেখে ওঙ্গারা দেশে ফিরে আসে।

এরপর দ্বিতীয় সফরের জন্য ওঙ্গার জাহাজ সমুদ্রে ভাসে—ভূমধ্য-সাগর থেকে যাত্রা শুরু করে ইজিয়ান দার্দানেলস্, মর্মরা, বসফরাস হয়ে রাশিয়ায় গিয়ে পৌঁছে।

গভীর পরিতাপের বিষয়, দ্বিতীয় সফরের শেষে জাহাজ ফিরে আসে কলকাতায়, কিন্তু ওঙ্গা নয়—তার জীবনাবসান ঘটে অত্যন্ত মর্মান্তিক রকমে।

ওঙ্গার স্মৃতি তর্পনে এই কথা কটি বলে নেবার প্রয়োজন আছে।

—উৎসর্গ—

৺ ওঙ্কার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

॥ ১ ॥

ছেলেবেলার কথাই বটে। আমার বয়স আর তখন কতই হবে—বছর আটেকের বেশি নয়। বড়দা বললেন—জাহাজ দেখতে যাবি খোকা ? প্রায় লাফিয়ে উঠে আমি বললাম—হ্যাঁ, যাবো। এ যেন শুধু জাহাজ নয়, একেবারে ছুনিয়া দেখার ডাক। আমার তো প্রায় তাই মনে হল।

জাহাজ আমি আগেই দেখেছিলাম। তবে আসল জাহাজ নয়, জাহাজের ছবি। এবার সত্যিকারের জাহাজ দেখতে পাব বলে মনটা ভারি চাঙ্গা হল। বড়দাকে তাড়া দিয়ে বললাম—আজকেই যাবে তো—

সত্যিকারের জাহাজ না দেখলেও আমি তখন স্টীমার দেখেছিলাম। বলতে গেলে জ্ঞান হবার পর পরই আমার স্টীমার দেখা হয়ে গিয়েছিল। আমাদের গাঁয়ের নদীতেই তখন স্টীমার চলত। দূর থেকে দেখলে মনে হত, স্টীমার যেন কোন স্বপ্নের দেশের খবর নিয়ে আসছে। আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম।

একটি অশ্চর্য স্টীমারের কথা এখনও আমার মনে আছে ; নাম তার ফ্যালকন। আমি তার পিঠের উপরকার ফ্যানেলটি দেখছিলাম। রাজার বাদশার মেজাজ নিয়ে ফ্যালকন এগিয়ে আসছিল। ফ্যানেলটি বীরের মতো দাঁড়িয়েছিল। সামান্য কাত হয়ে। —তার মুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বের হচ্ছিল। আরও খানিক এগিয়ে আসতে বেশ দেখতে পেলাম। ফ্যালকনের ছুপাশে ছুটো চাকা রয়েছে। বড় বড় চাকা। চাকা ছুটো ঘুরছে। আর জল কাটছে—স্টীমারটা এগিয়ে আসছে। বটেই তো, এত বড় ছুটো চাকা না থাকলে স্টীমার কি আর স্টীমার হত। নাকি জলের উপর দিয়ে চলতে পারত। এ হচ্ছে আমার তখনকার মনের কথা। ফ্যালকনের আগেও আমি অন্য স্টীমার

দেখেছি। কিন্তু অমন করে খুটিয়ে দেখা এই প্রথম—অন্য সব স্টীমারের কথা আমার আর কিছু মনেই নেই।

বছর বছর একটু করে বড় হচ্ছি। আমার স্টীমার ঘাটে যাতায়াত একটু করে বাড়ছে—স্টীমারের বিস্ময়গুলোর সাধ আমি মিটিয়ে দেখেছি। আর ঠিক তখনই একদিন শুনতে পেলাম জাহাজের কথা—জাহাজ নাকি আরও অনেক বড়। সাগরে সমুদ্রে চলে। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায়। সমুদ্র। আর তখনই একদিন বইয়ের পাতায় জাহাজের ছবি দেখলাম। সমুদ্র কি বস্তু তখনও জানি না। তবু কিন্তু আশা করতে লাগলাম। একদিন জাহাজ দেখব, সমুদ্রও দেখব।

প্রথম জাহাজ দেখার কথা এখনও আমার বেশ মনে আছে। খিদিরপুর ট্রাম ডিপো থেকে দক্ষিণে খানিক এগিয়ে বাঁদিকের গেট দিয়ে ঢুকে পড়েছিলাম। তখন বাইশ নম্বর জেটিতে বাঁধা ছিল মস্ত একটা জাহাজ, নাম তার এস-এস কুমায়ুন। বড় বড় চোখে আমি কুমায়ুন জাহাজটা দেখে নিলাম। তারপর বড়দাকে বললাম—জাহাজের দুপাশে দুটো চাকা নেই কেন?

বড়দা বললেন—জাহাজে তো চাকা থাকে না, চাকার বদলে পেছনে একটি প্রপেলার ঘোরে। আর তাতেই জাহাজ চলে।

কুমায়ুনের পেছনে গিয়ে প্রপেলারও দেখে নিলাম। দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। তিন ব্লেডের প্রপেলার। দেখতে অনেকটা সিলিং ফ্যানের মতো। তার এক ব্লেড জলের উপর খাড়া হয়ে আছে। স্টীমারের চাকার চাইতে প্রপেলার তো খুবই ছোট। এতবড় জাহাজ কি করে চলে তখন আর ভেবে পেলাম না।

জেটিতে হাঁটতে হাঁটতে আমরা এগিয়ে চললাম। বাইশ থেকে সাতাশ নম্বর পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে আমরা অনেক জাহাজ দেখলাম। বাইরে থেকেই। জাহাজে গিয়ে উঠে ঘুরে ফিরে সব দেখা আর সম্ভব হল না। সাতাশ নম্বরের কাছেই ছিল গেট—গেটের বাইরে এসে আমরা রিমাউন্ট রোড দিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

আশ্চর্য, আমি কিনা নিজেই এখন জাহাজে কাজ করি—কলকাতার

জাহাজ ডক বলতে গেলে এখন আমার মুখস্থ। দেখার মতো অনেক কিছুই কলকাতায় আছে—এখন আবার পাতাল রেল হয়েছে। আজও তবু ডক দেখতে অনেক লোক আসে। খিদিরপুর ট্রাম ডিপো থেকে এগিয়ে ডাইনের গেট দিয়ে ঢুকে পড়ে। ওখানেও অবশ্য অনেক জেটি, অনেক জাহাজ। এগারো থেকে এক, ওদিকের আট থেকে ছুনম্বর পর্যন্ত জেটিতে জাহাজে জাহাজে ছয়লাপ। ছুনম্বর থেকে এগিয়ে যাও। ডাইনে বি. এন. আর রেখে আরও একটু এগোলে ভূতঘাট। কাছেই নেতাজী সুভাষ ডক। সেখানে জাহাজের আর অন্ত নেই।

কলকাতা থেকে জাহাজে উঠে আমরা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছি। মালবাহী জাহাজ, নাম তার রাজহংস। কুমায়ুন চলত কয়লা পুড়িয়ে। তাই বলত স্টীম শিপ কুমায়ুন। সংক্ষেপে এস-এস কুমায়ুন। রাজহংস এযুগের জাহাজ, তেল পূড়িয়ে চলে বলে মোটর ভেসেল রাজহংস—সংক্ষেপে এম-ভি রাজহংস। বন্দরে বন্দরে ঘুরে মালভরাট, মাল খালাস করে শেষ পর্যন্ত রাজহংস ভিড়বে গিয়ে লণ্ডনের ঘাটে। অবশ্য জাহাজের যাতায়াত সব সময় ঠিক থাকে না—কোন বন্দর বাদ পড়ে যায়। নতুন কোন বন্দর আমাদের তালিকায় স্থান পায়।

আমরা রওনা হয়েছিলাম তেইশ নম্বর খিদিরপুর ডক থেকে। ভোরের দিকে। আকাশের তারারা তখনও রাত জেগে বসে ছিল। একরাশ কালো মেঘ তখন পশ্চিম আকাশের গা বেয়ে দারুণ বেগে ছুটে চলেছে—যেন ঐদিকে কোন গুরুতর কাজ আছে!

তেইশ নম্বর ছেড়ে এগিয়ে এসে রাজহংস তখন একটি পুলের ধারে দাঁড়িয়ে পড়েছে। হাইড্রলিক পুল। মেটেবুরুজ, বি-এন-আর যেতে এটা এক সড়ক সেতু—জাহাজ দেখলেই পথ ছেড়ে দেয়। আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। পুল একবার মাথা তুললে অনেক জাহাজ পার হয়ে যায়। আমাদের পেছনে তখন গৌরীশঙ্কর আর জগদ্‌গুরু জাহাজ—পুলের দুধারে কাতারে কাতারে মানুষ এবং গাদাগাদি করে বাস, লরি, রিক্সা, স্কুটার, ট্রাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। আমরা এবার এগিয়ে

চলেছি। লোক তামাসা দেখছে—ডকে না ঢুকে, নদীতে না বেরিয়ে, সমুদ্রে না গিয়ে সবাই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, রাজহংস, গৌরী-শঙ্কর, জগদগুরুর মতো বড় বড় জাহাজ কত সহজে কেমন গম্ভীর মেজাজে চলে যাচ্ছে। একেবারে শহরের মধ্য দিয়ে।

পূব আকাশ অনেক আগেই ফরসা হয়ে গিয়েছিল। দুপাশের জেটিতে যে সব জাহাজ বাঁধা আছে তাদের সব আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবার আটটা বাজে। জেটির জাহাজে জাহাজে পতাকা তুলে দেওয়া হচ্ছে—আপন আপন দেশের পতাকা। জাহাজ কোম্পানীর নিজস্ব পতাকাও। এবং জাহাজের সামনে ভারতীয় পতাকা। এটাই নিয়ম। আমরাও যখন যেদেশেই যাই, সেই সেই দেশের পতাকা জাহাজের সামনে টাঙিয়ে দেই।

আরও একটি সড়ক সেতু পেরিয়ে এবার আমরা লক গেটের মুখে এসে পড়েছি। পেছনে যে দুটো সড়ক-সেতু ফেলে এসেছি তা পেরিয়ে আসতে অনেকটা সময় লাগে। কারণ পুল খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অজস্র টাগ বোট, গাদা বোট, ডিঙি নৌকা এ-ডক থেকে সে-ডকে যাতায়াত করে। ফলে বড় জাহাজগুলোর দেরি হয়ে যায়।

লক গেটেও খানিক সময় নষ্ট হয় বটে, কারণ গঙ্গার জল থাকে ডকের জলের লেভেল থেকে নিচে। জাহাজ এসে দাঁড়ালেই লক গেটের দুদিক বন্ধ করে শক্তিশালী পাম্পের সাহায্য জল বের করে দিয়ে নদীর জলের লেভেল করা হয়—তখন জাহাজ গিয়ে নদীতে পড়ে।

ডক তৈরীর সময় গঙ্গা জলের লেভেলে জল রাখার ব্যবস্থা করলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যেতো—কথাটি তুললেন অপলা মুখার্জী। রাজ-হংসর চিফ এঞ্জিনীয়ার অশোক মেননের স্ত্রী।

তা যে সম্ভব নয় ব্যাপারটি আমাকেই বুঝিয়ে বলতে হল—নদীর লেভেলে ডকের জল থাকলে ভাঁটার সময় খুব বিপদ হত। জেটির জল অনেক নিচে নেমে যেতো। ফলে জাহাজও নেমে যেতো নিচে। দড়ি কাছি ছিঁড়ে একাকার হয়ে যেতো—জাহাজ বেঁধে রাখা যেতো না। আর জোয়ারের সময়? জোয়ারের জল এসে ডক দিত ভাসিয়ে—

মালপত্র সব তছনছ হয়ে যেতো।

ডক তৈরী করবার আগে এইসব কথা ভাবতে হয়েছিল। কারণ গঙ্গানদীর জোয়ার ভাঁটার জোর খুব বেশি। ডক থেকে বেরিয়ে গঙ্গা নদীতে এসেই তো গঙ্গা বেয়ে সাগরে যেতে হয়। তারপর সাগরপাড়ি দিয়ে পৃথিবীর দেশে দেশে!

॥ ২ ॥

জাহাজ এবং জাহাজ সম্পর্কিত কথাগুলো আমি পেলাম কোথায়, এই তো? আগেই তো বলেছি আমি জাহাজের লোক। থার্ড মেট। জাহাজে সবার উপরে রয়েছেন ক্যাপটেন—তারপর ফাষ্ট মেট, সেকেণ্ড মেট, থার্ড মেট, চলতি কথায় ফাষ্ট অফিসার। সেকেণ্ড অফিসার, থার্ড অফিসার। চলতি জাহাজে মেটদের ডিউটি ব্রিজে।বন্দরে অন্যরকম—মাল ভরাট মালখালাস সম্পর্কে সবরকম কাজতাদের দেখতে হয়। রাজহংস যখন লকগেট ছেড়ে গঙ্গায় এসে পড়েছে আমি তখন ব্রিজেই ডিউটি করছিলাম। যতদিন জাহাজ জলে ভেসে চলবে ততদিন দিনে রাতে আমার আটটা বারোটা, সেকেণ্ড মেটের বারোটা চারটে, ফাষ্ট মেটের চারটে আটটা ডিউটিথাকবে ব্রিজে। ব্রিজ হচ্ছে জাহাজ চালনার প্রধান কেন্দ্র। এখানেই চার্টরুম, হুইল হাউস, ওয়্যারলেস রুম ইত্যাদি রয়েছে। সমুদ্রে জাহাজ কোন্ পথে চলবে চার্ট বা ম্যাপ মিলিয়ে দেখে তা ঠিক করতে হয়। চলার পথেও ঘন ঘন চার্ট মিলিয়ে দেখতে হয়, জাহাজ ঠিক পথে চলছে কিনা। হুইল হাউসে থাকে কম্পাস, ষ্টিয়ারিং হুইল, টেলিগ্রাফ, একোসাউণ্ডার বা জল মাপার যন্ত্র, রেডার ইত্যাদি। জাহাজ চালনার জন্য এগুলোর বিশেষ দরকার।

ব্রিজে আমি এখন খুব ব্যস্ত। জাহাজে এখন পাইলট রয়েছেন—সাগরে পৌঁছানো পর্যন্ত তাঁর নির্দেশেই জাহাজ চলবে। পাইলট কেবলই বলছিলেন—হাফ এ্যাহেড, স্টপ্ হার, স্লো এ্যাস্টার্ণ্ ইত্যাদি

অর্থাৎ অর্ধেক বেগে সামনে চল, থামাও, ধীর বেগে পেছনে চল। ছয় বছরের একটি বাচ্চা মেয়ে হুইল হাউসের এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে সব লক্ষ্য করছিল। নাম তার সোমা, সবাই বলে ওঙ্গা। ওঙ্গা ভারি অবাক হয়ে গিয়েছিল। কারণ পাইলটের হুকুম শুনে আমি ছুটে গিয়ে টেলিগ্রাফ চালিয়ে দিচ্ছিলাম—সঙ্কেত পাবার সঙ্গে সঙ্গে এঞ্জিন ঘর থেকে পাইলটের হুকুমমত কাজ করা হচ্ছিল। জাহাজ চলা কালে এঞ্জিনীয়াররা টেলিগ্রাফ সঙ্কেত পাবার জন্য এঞ্জিন ঘরে সব সময় তৈরী হয়েই থাকেন। ওঙ্গা সবচেয়ে বেশি অবাক হচ্ছিল পাইলট যখন বলছিলেন পোর্ট টেন, কিংবা স্টার বোর্ড ফাইভ, অর্থাৎ দশ ডিগ্রী বাঁয়ে চল। পাঁচ ডিগ্রী ডাইনে চল—পাইলটের হুকুমে স্টিয়ারিং হুইল চালিয়ে যাচ্ছিল একটি জোয়ান ছেলে, আর মুখে বলছিল—পোর্ট টেন স্যার, স্টারবোর্ড ফাইভ স্যার। ডক থেকে জাহাজ বেরোবার সময় হুইল হাউসে এত সব কারখানা চলে। সবাই কত সতর্ক হয়ে কাজ করে। এ যেন কলকাতার রাস্তা—ট্রাম চলছে, বাস চলছে, ঠেলা-রিক্সা-মানুষ চলছে। তার মধ্য দিয়েই তোমাকে আপন গাড়ি চালিয়ে চলতে হবে। খুব সাবধানে। নইলে বিপদ ঘটবে। ডক বা নদীর জলপথেও তো অন্য জাহাজ, লঞ্চ, নৌকা চলছে। সাবধানে জাহাজ না চালালে চলে!

সোনা চিফ এঞ্জিনীয়ারের মেয়ে, মা বাবার সঙ্গে বিলেতে চলেছে। ওর ভাবখানা এমন, যেন বিলেতে পড়তে যাচ্ছে—জাহাজে যেতে যেতে সমুদ্র দেখবে। আরও কত দেশ দেখবে, কত সব আশ্চর্য জিনিস দেখবে। জাহাজে এসে এ পর্যন্ত যা কিছু দেখেছে সবই ওর ভাল লেগেছে, শুধু মনে একটি খটকা এসেছে—ডকে রাজহংসর মতো এতবড় জাহাজটি কেন এত আস্তে চলে। তাছাড়া আরও একটি জিনিস ওর ভাল লাগে নি—ওর ডাক-নাম যে ওঙ্গা, জাহাজের সবাই তা জেনে গেছে।

ওঙ্গা নামটি সৃষ্টি হয়েছে অদ্ভুত রকমে। সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বেলে ঘরে ঘরে আলো দেখিয়ে আর গঙ্গা জল ছিটিয়ে সোনার ঠাকুমা বলতেন—

গঙ্গা, গঙ্গা ! বয়স তখন দুবছর হলে কি হয়—সোনা সব খুঁটিয়ে দেখত আর শুনত খুব মনোযোগ দিয়ে। তারপর সোনা একদিন করলে কি ! ঠাকুমার গঙ্গাজলের ঘট-হাতে ঘরময় ঘুরে জল ছিটিয়ে বলতে লাগল—ওঙ্গা, ওঙ্গা ! গঙ্গা কথাটি তখনও ওর মুখে ফোটে নি। সেই থেকে ওকে সবাই বলতে লাগল ওঙ্গা।

এরই মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি সময় পার হয়ে গিয়েছে। কাল লকগেট থেকে বেরিয়ে সকাল সাড়ে নটা নাগাদ রাজহংস গার্ডেন রীচের গঙ্গায় নোঙর করেছিল। রাত বারোটায় নোঙর তুলে গঙ্গা বেয়ে চারঘণ্টা চলেছিলও বটে—কিন্তু ভোর চারটায় আবার নোঙর করতে হয়েছিল। কারণ গঙ্গায় বেশি জল ছিল না। অথচ আমাদের জাহাজে মাল ছিল মোটে তিন হাজার টন—চা, কার্পেট, যন্ত্রপাতি সবই কলকাতায় ভরাট হয়েছিল। আগে দশ বারো হাজার টন মাল নিয়ে অনেক জাহাজ গঙ্গায় চলত। কিন্তু এখন যে গঙ্গায় চড়া পড়তে শুরু করেছে—বেশি মাল ভরাট হলে জাহাজের তলা গিয়ে মাটিতে ঠেকে যায়।

অবশ্য গঙ্গা নদীতে চড়া পড়া বন্ধ করতে চেষ্টা করাও হচ্ছে বটে—দুটো জাহাজ গঙ্গার তলা থেকে মাটি কাটছে, নাম তাদের গঙ্গা আর ভাগীরথী। আসলে ড্রেজার অর্থাৎ মাটি কাটা জাহাজ। গঙ্গা থেকে মাটি কাটা হচ্ছে রোজ একলাখ টন হিসেবে—বছরে তার জন্য খরচ হচ্ছে দশ কোটি টাকা। শুধু কি তাই ? আড়াইশ কোটি টাকা খরচা করে ফরক্কায় বাঁধ তৈরী করা হয়েছে। তবু কিন্তু পুরো মাল নিয়ে এখনও হুগলী নদীতে জাহাজ চলতে পারে না।

বলছিলাম গঙ্গা নদীর কথা ; হঠাৎ আবার হুগলী নদী এলো কোত্থেকে !

সে এক ইতিহাস। তা হলে ইতিহাসের কথাও একটু বলে নিতে হবে বৈকি ! সাড়ে চারশ বছর আগের কথা। সপ্তগ্রাম তখনও বড় বন্দর। সরস্বতী নদীর তীরে। এখনও সরস্বতী নদী রয়েছে। তবে মজে গেছে। তা পর্তুগীজ লোকেরা পর্তুগাল থেকে সপ্তগ্রামে

এসে ব্যবসা বাণিজ্য করছিল। কিন্তু সরস্বতী নদীর মুখ বুজে আসতে লাগল, নদী ভরাট হতে শুরু করল। কি আর করবে—পর্তুগীজরা ভাঁটিতে সরে এসে আর একটা বন্দর তৈরী করে নিল, নাম তার হুগলী। পাশ দিয়ে গঙ্গা নদী বইছিল। শেষপর্যন্ত হুগলী থেকে গঙ্গা সাগর পর্যন্ত গঙ্গার নামই হয়ে গেল হুগলী নদী। এখনও সেই নাম বজায় আছে। বিশেষ করে জাহাজীদের কাছে। চার্টেও তাই লেখা রয়েছে আর পাইলট ? গঙ্গা-পাইলট নয়, হুগলী পাইলট।

হুগলী নদী আসলে বিদেশীদের দেওয়া নাম। পর্তুগীজদের পর পর বিদেশী লোক বাংলায় ব্যবসা করতে আর কিছু কম এসেছে ? ওলন্দাজরা চুঁচুড়ায়। ফরাসীরা চন্দননগরে কুঠি বানিয়ে দিব্যি ব্যবসা করে যাচ্ছিল। শেষপর্যন্ত এলো ইংরেজরা। ইংরেজকুঠি উঠল কলকাতায়। ব্যবসা করতে এসে ইংরেজ শেষ পর্যন্ত আমাদের দেশটাই দখল করে নিল। কিন্তু সে আবার অন্য কথা !

জাহাজে সাজো সাজো রব পড়ে গেছে। কি ব্যাপার ? বেলা বারোটায় জোয়ার আসছে। আমরা রায়চকে নোঙর করে বসেছিলাম। জোয়ার এলে নদীতে জল বাড়বে। নোঙর তুলে রাজহংস সাগরের দিকে রওনা হবে। আর শুধু রাজহংস নয়, যতো জাহাজ রায়চকে নোঙর করে বসে আছে—সবগুলো। কেউ আর চুপচাপ বসে থাকবে না।

ভাগ্যিস এখন গঙ্গায় জোয়ার হয়। বৈজ্ঞানিকরা কিন্তু অঙ্ক কষে হিসেব করে বলে দিয়েছেন—পঞ্চাশ হাজার বছর পরে গঙ্গায় আর জোয়ার হবে না। কেন, কি ব্যাপার ? কারণ তখন চাঁদের আকর্ষণ যাবে দারুণ কমে, ফলে সাগরের জলকে এখনকার মতো জোয়ারের বেগে টেনে কলকাতায় দিকে আনতে পারবে না। গঙ্গায় আর জল বাড়বে না।

তখন ? তখন আমরা কেউই থাকব না। তখনকার মানুষ কি করে জাহাজ চালায় জানতেও পারব না !

কিন্তু তখন কি আর রাজহংসর মতো জাহাজ থাকবে; নদীতে সাগরে চলবে—নাকি গঙ্গা নদীটাই মরে যাবে ?

॥ ৩ ॥

জোয়ার এসে পড়তেই নোঙর তোলা শুরু হয়ে গেছে। ফাস্ট অফিসার, কারপেণ্টার ডেক সারোঙ আহ্নিতে অর্থাৎ জাহাজের মাথায় নোঙর তোলার কাজ নিয়ে মহাব্যস্ত। জাহাজের ধারে ছুটো হাত ধার বুক ঠেকিয়ে ফাস্ট অফিসার উবু হয়ে দেখছেন শেকল ঠিকমতো উঠে আসছে কিনা এই শেকলের একদম শেষে বাঁধা রয়েছে নোঙর। জলের তলে গিয়ে যা মাটি কামড়ে পড়ে আছে।

নোঙর বলতে লোহার তৈরী ছোট একটি যন্ত্রের মতো। বলতে গেলে জাহাজের প্রাণ—বিশ্বস্ত বন্ধুর চেয়েও বেশি। মাটি কামড়ে পড়ে থাকে বলেই তো জাহাজ এলোমেলো ভেসে চলে না। এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শেকল ছিঁড়ে কখন সখন নোঙর টুক করে জলে পড়ে যায়। আর চিরদিনের মতো হারিয়ে যায়। তখন কিন্তু কেউই বলে না—নোঙরটা তুলে আনতে হবে।

জল থেকে সবটা শেকল ওঠা শেষ হলে শেষ পর্যন্ত উঠে এলো নোঙর। ব্রিজে দাঁড়িয়ে পাইলট এতক্ষণ নোঙর তোলা তদারক করছিলেন। নোঙর উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে বললেন—হার্ড-এ-স্টার বোর্ড। রঞ্জন চট্টরাজ স্টিয়ারিং হুইল ধরে এতক্ষণ সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল; পাইলটের হুকুম শুনে হুইল ডাইনে পুরো ঘুরিয়ে বলল—হার্ড-এ-স্টার বোর্ড স্যার। জাহজের মাথা ডাইনে সরতে থাকলে পাইলট আবার বললেন—মিডশিপ। 'মিডশিপ স্যার' বলতে বলতে রঞ্জন হুইলটি ডান থেকে মাঝামাঝি অবস্থায় নিয়ে এলো, জাহাজের গতি তখন আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। পাইলটকে এবার বলতে শোনা গেল—স্টেডি-এ্যাজ-শী-গোজ্। জাহাজের মাথা যাতে ডাইনে বাঁয়ে

এলোমেলো সরে না যায় সেইদিকে লক্ষ্য রেখে রঞ্জন স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাতে লাগল।

স্টিয়ারিঙের চাকা ঘুরিয়ে জাহাজের মাথা ঠিক রাখাই রঞ্জনের কাজ। এজন্য তাকে বলে হেল্‌ম্‌স্‌ম্যান। কারণ জাহাজের হালকে ইংরেজীতে বলে হেল্‌ম্—হেলম্‌টি কলের কায়দার স্টিয়ারিং হুইলের সঙ্গে যুক্ত। রঞ্জনকে স্টিয়ারিঙের চাকা ঘোরাতে দেখে মিসেস অপলা মুখার্জী বলেছিলেন—ওঙ্গা ছাখ্ ড্রাইভার জাহাজ চালাচ্ছে। হেলম্‌স-ম্যান কিন্তু জাহাজের মোটেই ড্রাইভার নয়। জাহাজ কোন্ দিকে যাবে, উত্তরে কিংবা পূবে, অথবা কম্পাস মিলিয়ে দশ ডিগ্রী কিংবা হু'শ ডিগ্রীতে জাহাজের মাথা রেখে হুইল চালাতে হবে) সেকথা পাইলটই বলে দেন ; সমুদ্রে গেলে ক্যাপটেন বা ডিউটি অফিসার। সুতরাং জাহাজের হেল্‌ম্‌স্‌ম্যান মোটেই মোটর গাড়ির ড্রাইভারের মতো নয়। আপন ইচ্ছায় জাহাজ চালাতে পারে না।

জাহাজে এঞ্জিনীয়ারদের অনেক কাজ করতে হয়, যন্ত্রপাতি ঠিক রাখতে অনেক খাটতে হয়। এঞ্জিন ঠিক না থাকলে তো আর জাহাজ চলতে পারে না। হাফ এ্যাহেড (অর্ধেক গতিবেগে সামনে চল) কিংবা ফুল এ্যাস্টার্ণ (পূর্ণবেগে পেছনে যাও) ইত্যাদি হুকুম ব্রিজ থেকে চালিয়ে দিলেই তো হল না। এঞ্জিন ঘরে তার কলকাঠি—সেইখান থেকেই সব কাজ হচ্ছে। এঞ্জিন বিভাগের কর্তাকে বলে চিফ এঞ্জিনীয়ার। চলতি কথায় বড়া সাব। ওঙ্গা কিন্তু ভেবে কূল পায় না। তার বাবাকে সবাই বলে বড়া সাব। অথচ ডেক অফি-সারদের মতো সাদা ইউনিফর্‌ম কেন তিনি পরেন না। ওর মা অবশ্য বুঝিয়ে দিয়েছেন, এঞ্জিন ঘরে যতো যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ। তেলকালি লাগে। এঞ্জিনীয়ারদের সবাইকে তাই বয়লার স্যুট পরতে হয়। এমনকি ডিউটির সময় ছাড়াও। কখন যন্ত্রপাতি বিগড়ে যাবে তার ঠিক নেই—খবর পেলেই তো এঞ্জিন ঘরে ছুটতে হয়—তখন আর চারটে-আটটা, আটটা-বারোটা, বারোটা-চারটের বাঁধা-ধরা ডিউটি নয়।

রাজহংস এবার সাগরের দিকে অনেকটা এগিয়েছে। বিরলাপুর, বজবজ, বাটানগর আমরা পেছনে ফেলে এসেছি। গঙ্গার দুই তীরের শোভা দেখতে কি ভালই লেগেছে—আম, নারকেল, কৃষ্ণচূড়া গাছের সার যেন হাতছানি দিয়ে আমাদের ডেকেছে। রাজহংস এগিয়ে চলছে; জল-ময়ূর, বাংলার দূত, ইণ্ডিয়ান রিনাউন ইত্যাদি জাহাজগুলোও আমাদের আগে পিছে রয়েছে কোনটি চট্টগ্রাম, কোনটি সিঙ্গাপুর, আবার কোনটি যাবে মোম্বাসা, লণ্ডন, ব্রিমেন। আমরা যাব আপাতত বাংলাদেশের চালনায়।

আমরা যতই এগোচ্ছি গঙ্গা নদীর বিস্তার ততই বাড়ছে। ভাঁটার সময় নদীর জল অনেক নিচে নেমে গিয়েছিল—অনেকগুলো নৌকো তখন নদী-কিনারে স্রেফ কাদার উপর দাঁড়িয়েছিল। জোয়ারের জল পেয়ে এবার নৌকোগুলো ভাসতে শুরু করেছে। এবার মালামাল নিয়ে রূপনারায়ণে পাড়ি জমাবে। আমাদের সামনেই রূপনারায়ণ নদ—ডানদিকে বেঁকে গেছে। কিছু নৌকো অবশ্য সুন্দরবনের দিকেও যাবে।

একটা মাটিকাটা জাহাজ গঙ্গায় মাটি কেটে চলেছে। ওদিকে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। অনেক নেংটিপরা গরিব ছেলে আপন আপন নৌকোয় দাঁড়িয়ে কেবলই চেঁচিয়ে বলছে—ও ভাই। ও সাহেব, ও দাদা, টিন-পট দাও, খালি বোতল দাও, তক্তা-কাঠ দাও! ওঙ্গা অবাক হয়ে দেখছে; ভেবে পাচ্ছে না টিন-পট, খালি বোতল দিয়ে ওরা কি করবে!

এবার হুগলী পয়েন্ট এসে গেছে। রূপনারায়ণের অনেকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। ওঙ্গা বেজায় খুশি—একটা, দুটো, তিনটে নদী—আঙ্গুল বাড়িয়ে ওঙ্গা বলছিল। আমি বললাম, তিনটে নয় দুটো। ওর কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না, কলকাতা থেকে যে গঙ্গা বেয়ে আমরা এসেছি, রাজহংস এখনও তারই জলে ভেসে চলেছে। এবং তার বাঁ তীর এখানে শেষ হয়েছে বলে গঙ্গা এখানে বাঁক নিয়েছে—তাই মনে হচ্ছে যেন আমাদের বাঁয় আরও একটি নদী বয়ে চলেছে।

রূপনারায়ণের মুখে এই জায়গাটার নাম হুগলী পয়েন্ট। খুব সতর্ক হয়ে এখানে জাহাজ চালাতে হয় যাতে চড়ায় গিয়ে না ঠেকে। হুগলী পয়েন্ট থেকে রূপনারায়ণের মোহনা পেরিয়ে মূল গঙ্গায় চলে আসতে মিনিট সাতেক লেগে গেল। যাকে বলে ভয়ঙ্কর সাত মিনিট। দেখলে মনে হয়, রূপনারায়ণ যেন কোন স্বপ্নের দেশ থেকে বয়ে এসেছে, ঐ নদী বেয়েই যেন আমাদের এগিয়ে যেতে হবে—হয়তো কোন রূপকথার দেশে।

আমাদের সামনে রয়েছে ডায়মণ্ডহারবার। ডাইনে মেদিনীপুর জেলা। ধানের ক্ষেতে সবুজের হাসি ছড়িয়ে আছে; মনে হচ্ছে কে যেন একটানা একটা সবুজ কার্পেট জমির উপর বিছিয়ে রেখেছে। আমাদের বাংলা যে এত সুন্দর! নারকেল বীথির ছায়া, বাঁশবনের মায়া, সোনাফলা উদার মাঠ যে এখন মধুময়, গঙ্গা নদী বেয়ে এই দিকে না এলে তা বোঝাই যেত না।

বর্ষাকাল সুরু হয়ে গিয়েছে। জলভরা কালো মেঘে অনেকটা আকাশ ছেয়ে আছে; বাকি আকাশ কোথাও নীল, কোথাও সাদা সাদা। কালো-সাদা-নীল আকাশের গায়ে রোদ লেগে ভারি একটা জেল্লা সৃষ্টি করেছে—আর তার ছায়া দুলছে জলে। কি সুন্দর, কি সুন্দর!

জমি ধারে নদীতীর বরাবর বাঁধ বেঁধে রাখা হয়েছে যাতে জোয়ারের সময় লোনা জল ঢুকে জমির ফসল নষ্ট করতে না পারে। বাঁধের ধারে ঘাসের মাঠে একপাল গরু লেজ নেড়ে মাছি তাড়িয়ে ঘাস খাচ্ছে —একবারটি আমাদের ফিরেও দেখছে না। আরও খানিক এগিয়ে ইট-খোলা চোখে পড়ছে; ছড়ানো ছিটানো ইট দেখে মনে হচ্ছে— ধ্যেৎ, ভারি বিশ্রী!

হ্যাঁ, এইবার আমরা ফলতার পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছি। জগদীশ চন্দ্রের সাদা রঙের দোতলা বাড়িটি খুব কাছে থেকে দেখতে পেয়ে মনে হচ্ছে, বড় যেন একলা বড় নিঃসহায়। অথচ এককালে বিজ্ঞান-বীর জগদীশ বসু এইখানে এসে মাঝে মাঝে নিরিবিলি গঙ্গাতীরে বাস

করে যেতেন। সেই নির্জন বাড়িটার এত কাছ দিয়ে আমরা চলে যাচ্ছি, যেন লোক থাকলে দিব্যি ডেকে কথা কওয়া যেত!

ডিউটি সেরে ব্রিজ থেকে আমি ক্যাবিনে এসে পড়েছি—ওঙ্গা এসে হাজির। ব্রিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাঠ ঘাট, বাঁশবন ইটখোলা দেখে ওর এখনও সাধ মেটে নি; তাই আমাকে এবার বলছে—চল না, ব্রিজে যাব। কিন্তু ব্রিজে যাওয়া আর হল না; বাত্তি সাব অর্থাৎ ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারকে আসতে দেখে ওঙ্গা আমার কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে খুব আস্তে করে বলল, মামু আসছে। রামু পিলাইকে ওঙ্গা কখন যে কি করে মামুতে পরিণত করে নিয়েছে তা ও-ছাড়া আর কেউ জানে না। কাছে এসে বাত্তি সাব ওঙ্গার গাল টিপে দিয়ে বলল—রসোগোল্লা খাবে খুকি অর্থাৎ খুকি তুমি রসগোল্লা খাবে?

বাত্তি সাবের কথায় ওঙ্গা ভারি মজা পায়। উল্টে বলে—আমাদের ঘরে আলো জ্বলছে না—তুমি ঠিক করে দেবে?।

ওঙ্গা দুষ্টু দুষ্টু হাসতে থাকে। জাহাজের যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ, মায় আলোকপাখী ঠিক রাখা পর্যন্ত বাত্তি সাবের কাজ। এই কাজ তার এক সহকারীরও আছে বটে, তাকে বলে ওয়্যারম্যান। ওঙ্গা অতশত বোঝে না—কিন্তু ক্যাবিনের আলো জ্বলার ব্যাপারটি ভালই বুঝে নিয়েছে। এবং আলো না জ্বলার কথা বলে বাত্তি সাবকে যে কিছু বেকায়দায় ফেলা যায়, ওঙ্গা তাও বেশ ভালই জানে।

কিন্তু বাত্তি সাবও কম যায় না। ওঙ্গাকে বোকা বানাতে বলল—ঘর নয় খোকি, ক্যাবিন। বলতে হ'বে ক্যাবিনে আলো জ্বলছে না!

ওঙ্গা একটু লজ্জা পেয়ে যায়। আমি ওর লজ্জা ভাঙাতে বললাম—তুমি এঞ্জিনিয়ার হবে ওঙ্গা?

ওঙ্গা বলল—আমি হব পাইলট!

॥ ৪ ॥

বাবার সঙ্গে সারাদিনে ওঙ্গার দেখাসাক্ষাৎ কমই হয়; বলতে গেলে ওঙ্গা সব সময় আমার সঙ্গেই ঘুর ঘুর করে। নদীতে জাহাজ চলছে—সবাই খুব হুসিয়ার। ওঙ্গা ব্রিজে গেলে আমার কিছু চিন্তা বাড়ে—যদি কোন যন্ত্রপাতিতে হাত দেয়। কিন্তু ও সত্যি বুদ্ধিমতী; ব্রিজে কি করে চলতে হয় বুঝে নিয়েছে।

জাহাজ এবার ডায়মণ্ডহারবারে। নোঙর ওঠার পরই ডাইনিং সেলুনে গিয়ে আমরা খেয়ে নিয়েছিলাম। তুপুরের খাবার ঘন্টি রোজকার মতো সাড়ে বারোটাতেই বেজে গিয়েছিল। লাঞ্চ খেতে ওঙ্গা আমার কাছাকাছিতেই বসেছিল। ওর বাবা অশোক সেন বসেছিলেন ডিউটি মেসে। ব্যস্ত লোক—কাজের পোশাক বয়লার স্যুট ছাড়া, ইউনিফরম পরা তার কাছে সময় নষ্টের ব্যাপার। বয়লার স্যুট পরে অন্য এঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে বসেই তিনি খাবার খান। ডাইনিং সেলুনের বদলে আলাদা ঘরে। সেই ঘরকে বলে ডিউটি মেস। ডেক অফিসার আমরা সাদা ইউনিফরম পরি বটে। কখন সখন বয়লার স্যুটও পরতে হয়। জায়গা পেলে আমরাও তখন ডিউটি মেসে বসে যাই।

যেতে যেতে কথাবার্তা যা হয় তা প্রায় সবই জাহাজ ঘেঁষা। আজই ফাস্ট অফিসার মিণ্টু মৈত্র ডিউটি মেসে খেতে বসে বলছিলেন, গত চব্বিশ ঘণ্টায় চল্লিশ টন জল খরচ হয়ে গেছে। খুবই চিন্তার কথা, কারণ কুড়ি টনের বেশি খরচ হওয়া উচিত ছিল না। পঞ্চাশ জন লোকের খানা পাকানো, জামা কাপড় ধোয়া, স্নান-খাওয়া ইত্যাদির জন্য রোজ কুড়ি টনই যথেষ্ট। রাজহংস চাল্‌নার পর যাবে সৌদি আরবের জেড্ডায়। সেখানে জলের বড় দাম; তেমন পাওয়াও যায় না। সুতরাং চালনায় বেশি করে করে জল নিতে হবে। ওঙ্গা

তখন কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। এসব কথার একবর্ণও বোঝে নি। সোজা চলে এসে আমার কাছে বসে পড়েছিল।

ডিউটি মেসে আরও অনেক কথা হয়েছিল। বিশেষ করে ফুয়েল পাম্পের কথা। এটায় কিছু গোলযোগ দেখা যাচ্ছে। এজন্য চার সাব অর্থাৎ ফোর্থ এঞ্জিনীয়ারের উপর চাপ পড়েছে খুব বেশি। কারণ ফুয়েল পাম্পের দায়িত্ব তারই। কিন্তু অশোক মেননের মাথাব্যথাটাই সবচেয়ে বেশি কারণ সমস্ত এঞ্জিন ঘরের দায়িত্ব তাঁর নিজের।

এই সব গুরুগম্ভীর কথা কি কারও ভাল লাগতে পারে? দূর মাঠে গরুরা ঘাস খাচ্ছে। গাছে গাছে নারকেল ঝুলছে, বাঁশবনের মাথায় পাখি উড়ছে—জাহাজ থেকে এসব দেখতে কার না ভালই লাগে। অপলা মুখার্জীর বোধ হয় একটু বেশি করেই ভাল লাগছে। কারণ বাঙালী ভাবটি তার মধ্যে খুব বেশি। বিয়ের পর তাই মেনন না হয়ে মুখার্জীই থেকে গেছেন।

ওঙ্গার খাওয়ায় তেমন মন নেই—শশা টম্যাটোর স্যালাড। একটুখানি চিজ, এক টুকরো পাঁপড় ভাজা ছাড়া কিছুই খেতে চাইছে না। লাঞ্চে খাওয়ার জিনিস কি আর কিছু কম? সেঁকা রুটি, বাসমতি চালের ভাত, মুগের ডাল, সবজী, মাংসের ঝোল, আম-লেবুর আচার, দৈ, ফল। ভাত খেতে ইচ্ছা না হয় মাখন মেখে পাউরুটি খাও। লেটুস-টম্যাটোর স্যালাড মুখে দাও। দৈ ফল তো রয়েইছে। পেট ভরতে অসুবিধা কোথায়? কিন্তু ওঙ্গার খেতে রুচি নেই।

ডাইনিং সেলুনে হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। ফোন ধরে এসে অপলা মুখার্জীকে বললাম—আমাকে ব্রিজে যেতে হচ্ছে। দশ মিনিটের মধ্যে। ওল্ডম্যান ডাকছেন।

ওল্ডম্যান মানে?—অপলা মুখার্জী শুধোন।

'মানে ক্যাপটেন।'

অপলা দেবী অবাক হন কারণ জাহাজে তার এই প্রথম সফর। কাপ্তান বলতে গেলে জোয়ান ছেলে। বয়স তিরিশের বেশি নয়। তবু আমি কেন ওল্ডম্যান বলছি ভদ্র মহিলা ভেবে পাচ্ছেন না।

আমাদের মতো ছেলে-ছোকরা ক্যাপটেনকে আড়ালে ওল্ডম্যান বলে বোধ হয় মজা পায়—অন্তত অপলা দেবী তাই ভাবলেন। গম্ভীর হয়ে আমাকে তিনি উপদেশ দিলেন—অমন বলতে নেই। কেউ যদি বলে দেয় ক্যাপটেন তোমার উপর রেগে থাকবেন।

আমাকে অগত্যা ব্যাখ্যা করে বলতে হয়; জাহাজের ক্যাপটেনকে পৃথিবীর সব জাহাজের সবাই বলে ওল্ডম্যান। সেই সাবেক কাল থেকে। তখন বারো চৌদ্দ বছরের ছেলে ঢুকত খালাসীর কাজ, নিয়ে; তাদের কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত অবশ্য ক্যাপটেনও হত। বুড়ো বয়সে তাই সবাই তাদের বলত ওল্ডম্যান। সেই রীতি এখনও চালু আছে। এখন পরীক্ষায় পাশ করলে তিরিশ বছরের মধ্যেই অনেকে ক্যাপটেন হয়। তবু তারা ওল্ডম্যান!

জাহাজে ওঙ্গা আর তার মায়ের কাছে সবই নতুন লাগছে। নদীর ধার বরাবর ডায়মণ্ড হারবারের রাস্তায় বাস যেতে দেখে ওঙ্গা বলল -- ঐ ছ্যাখো, বাস যাচ্ছে। আর শুধু ওঙ্গা কেন, জাহাজের সবাই সবাইকে ডায়মণ্ড হারবারের রাস্তায় বাস চলা দেখায়। কলকাতায় ভিড়ের রাস্তায় বাস চলে; কেউ কাউকে ডেকে বলে না—ঐ ছ্যাখো, বাস যাচ্ছে!

ডায়মণ্ড হারবারের নদীর ধারে জাহাজের মতো করে তৈরী রেস্ট হাউসটি ওঙ্গাকে দেখিয়ে বললাম—ঐ যে, আর একটা জাহাজ!

চট করে ওঙ্গা বলল—ওটাতো জাহাজ নয়।

'কেন নয়? ঐ তো ওপরে ফানেল রয়েছে?'

'কিন্তু লাইফ বোট নেই কেন', ওঙ্গা বললে—'জাহাজ যদি হবে, ওর মাস্তুল কোথায়?'

সত্যি, জাহাজে ওঙ্গা অল্প সময়ে অনেক কিছু শিখে ফেলেছে!

গঙ্গায় ভুশ ভুশ করে শুশুক উঠতে দেখে ওঙ্গা আর চোখ ফেরাতে পারছে না—মনে মনে ভাবছে, কলকাতায় ফিরে পাশ-বাড়ির রুমা-ঝুমাকে শুশুক দেখার কথা বলে অবাক করে দেবে। তারা তো ডায়মণ্ড হারবারে এসে জাহাজে দাঁড়িয়ে গঙ্গায় শুশুক-ওঠা ছ্যাখে নি

আর শুধু কি শুশুক ? ওধার গঙ্গায় ছোট একটা হাঙর পর্যন্ত সাঁতার কেটে চলে যাচ্ছিল। ওঙ্গা তা পর্যন্ত দেখেছে। আশ্চর্য, এরই মধ্যে হাঙর-দেখাও হয়ে গেল !

জাহাজে ডায়মণ্ড হারবার পর্যন্ত আসার পথে ঘাসের মাঠ, ধানের ক্ষেত, নারকেলের বন দেখে প্রথমে কিন্তু আমার একটি আশ্চর্য কথা মনে হয়েছিল ; সেই প্রথম দেখার দিনে আমি মনে মনে বলছিলাম—এই আমাদের বঙ্গভূমি। সোনার বাংলা। এই গাছের দেশ, মাঠের দেশ, আশ্চর্য সব নদীর দেশে আমরা জন্মেছি ! জাহাজে কাজ করতে এসে আমরা কিন্তু এমন দেশও দেখেছি—যেখানে ঘাস নেই, গাছ নেই, নদী নেই। সত্যি আমরা ভাগ্যবান !

ডায়মণ্ড হারবারের পর গঙ্গার দুই কুল ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, সমুদ্র বুঝি বা কাছেই। কিন্তু আরও পঁচাশী মাইল এগিয়ে গেলে তবে সমুদ্রের দেখা পাব—পাইলট তখন নেমে যাবেন। নিজেদের ইচ্ছামতো আমরা তখন জাহাজ চালাব।

আশপাশে অনেকগুলো জেলে ডিঙি জাল ফেলে মাছ ধরছে। ডায়মণ্ডহারবারের আগেও দেখেছি। জোয়ারের মুখে জাল পেতে রেখে জেলেরা নৌকোয় বসে তামাক খাচ্ছে। ভেবেছি, জাল তুললে না জানি কত মাছ দেখতে পাব। কিন্তু দেখা আর হয় নি। আমরা যে ছুটতে ছুটতে এসেছি—জোয়ারের জল থাকতে থাকতে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে ; ভাঁটা পড়ে গেলে তো আর এগোনো যাবে না। একদিন দেরি হলে যে জাহাজ-কোম্পানীর অনেক ক্ষতি। প্রায় সত্তর হাজার টাকা। জাহাজ পোষা তো হাতি পোষা—নইলে কি রোজ খরচ সত্তর হাজার টাকা হয় ! লোকজনের মাইনে, ডক-ভাড়া, পাইলট খরচ, জাহাজ মেরামত খরচ—সব মিলে তো অনেক খরচ !

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে ! গঙ্গার খাড়ি জুড়ে অনেক লাল, নীল, সবুজ আলো দপদপ করে জ্বলছে আর নিবছে—এদিকে লাল আলো জ্বলে ওঠে তো ওদিকে নীল আলো ; সেদিকে হলদে আলো। সন্ধ্যা-নদীর জলে কি তবে দেওয়ালীর উৎসব শুরু হয়ে গেছে ?

আসলে এই আলো দেখে দেখে পাইলট এখন জাহাজ চালাচ্ছেন—ডাইনে লাল আলো, বাঁয়ে নীল আলো রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হচ্ছে। রাতের অন্ধকারে তো আর কিছু দেখা যায় না; সাগর পর্যন্ত সার সার লাল আর নীল আলোই তখন ভরসা—মাঝখানে জাহাজ চলার পথ। কোথায় কোন আলো জ্বলছে, কি তার অর্থ, খুব কম জল থাকলে কোথায় কি রঙের আলো জ্বলে, পাইলটের সব মুখস্থ। জাহাজের মাথা ভুল করে ডাইনে বাঁয়ে সরে গেল তো, ব্যস—জাহাজ গিয়ে চড়ায় উঠবে। হিমালয় থেকে যাত্রা সুরু করে গঙ্গা তো পথে পথে অনেক জঞ্জাল, অনেক পলি মাটি বয়ে নিয়ে আসছে—সব এসে জমা হচ্ছে নদীর মোহনার দিকে। ক্রমে চড়া পড়ে যাচ্ছে। চড়া ঠেলে তো আর জাহাজ সাগরে যেতে পারে না। তাই মাটি কেটে কেটে পথ চালু রাখা হয়েছে।

অপলা দেবী তর্ক তুললেন—কিন্তু কলকাতার পর এ পর্যন্ত তো কোন আলো জ্বলতে দেখি নি—গঙ্গা জুড়ে তো জাহাজ চলার পথ আর নেই—সরু খাড়িতেই জাহাজ চলে। আলো না দেখে জাহাজ চরে কি করে এলো?

'দিনের বেলায় তো আলো জ্বলে না।' আমাকে বুঝিয়ে বলতে হয়—সারাটা নদী জুড়ে রয়েছে যতো সব বয়া। লাল আর কালো বয়া। দিনের বেলায় কলকাতা থেকে সাগরের দিকে এগিয়ে যেতে লাল বয়াগুলোকে ডাইনে, কালো বয়া বাঁয়ে রেখে আমরা এগিয়ে যাই। রাতের বেলায় এই বয়াগুলোর মাথায় লাল আর নীল আলো জ্বলে। দপ্ দপ্ করে। নদীতে জোয়ারের জল থাকলে রাতের বেলাতেও সাগর থেকে জাহাজ কলকাতায় আসতে পারে।

জাহাজ চালাতে কায়দার অন্ত নেই—ঘাটে ঘাটে আর ঘাটে ঘাটে অনেক কায়দা, আর অনেক কৌশল!

॥ ৫ ॥

ভোরের দিকে একটা দারুণ স্বপ্ন দেখলাম—আমি কিনা আটলান্টিক মহাসাগরের জলের তলে চলে গিয়েছি। সেখানে খুব বড় একটি মন্দির রয়েছে। দরদালান পেরিয়ে মস্ত একটি হলঘর—তার মাঝখানটিতে খড়্গহাতে মাকালী শিবের বুকে পা রেখে দাঁড়িয়ে মিট মিট করে হাসছেন। আমি অবাক হয়ে দেখছি আর ভাবছি—কি তাজ্জব, সমুদ্রের জলের তলে কে তৈরী করল এই মন্দির, কে প্রতিষ্ঠা করল এই কালীমূর্তি; জলের তলে আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছিই বা কি করে!

ঘুম ভাঙলে নিজেকেই আমি বলতে লাগলাম—কি আশ্চর্য, আমি রাজেশ প্রসাদ মহানন্দ, রাজহংসর থার্ড অফিসার। গঙ্গাসাগরে জাহাজ নোঙর করে আছে, নিজের ক্যাবিনে ডানলোপিলোর গদি আঁটা স্প্রিংকরা খাটে আমি শুয়ে আছি—হঠাৎ আটলান্টিকের তলায় চলে যাবার স্বপ্ন দেখার অর্থ? আটলান্টিকে আমি বারকয়েক পাড়ি জমিয়েছি বটে—তার জলের তলে চলে যাবার কথা তো ভাবি নি।

পোর্ট হোল খুলে দেখলাম, মাইলটাক দূরে সাগর লাইট হাউস দেখা যাচ্ছে। বেশ মনে পড়ল, কাল রাত সাড়ে আটটায় রাজহংস এখানে নোঙর করেছিল, কারণ ডায়মণ্ড হারবার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত আসতেই ভাঁটা সুরু হয়ে গিয়েছিল। চোখ মেলে তাকিয়ে মনে হল, এক চিলতে আকাশ যেন ফরসা হয়ে এসেছে; অগ্নিকোণের আকাশ থেকে অদ্ভুত একটি শব্দ ভেসে আসছে—তোক, তোক ঢাক! ধ্যেৎ তেরি বলে আবার আমি শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকাল বেলা। সেভেন-ও-ক্লক-স্যার বলে দরজায় টোকা মেরে গিরিধারী আমাকে জাগিয়ে দিয়ে টেবিলের পর এক কাপ চা রেখে গেল। বেড-টি। এবার আমাকে চান-টান সেরে ব্রিজ-ডিউটিতে

যেতে হবে—সকাল আটটা থেকে বারোটা; তারপর আট ঘণ্টা অবসর নিয়ে আবার রাত আটটা-বারোটা। আগেই তো বলেছি, আমরা চালু জাহাজে দিনে-রাতে আট ঘণ্টা ডিউটি করি—থার্ড অফিসার, সেকেণ্ড অফিসার, ফাস্ট অফিসার বা চিফ অফিসার হিসেবে আমরা মোট তিনজন। কাজ কি কিছু কম? জাহাজের অবস্থান বের কর অর্থাৎ কত ডিগ্রী দ্রাঘিমা, কত ডিগ্রী অক্ষাংশে জাহাজ রয়েছে অঙ্ক কষে বের করা, জাহাজ ঠিক পথে চলছে কিনা লক্ষ্য রাখা, ঝড় তুফান দেখা দিলে কর্তব্য ঠিক করা এবং সব সময় ক্যাপটেনকে সব কিছু জানানোই আমাদের কাজ। ডিউটির সময় বাদে খাও, ঘুমাও, খেলা কর—কেউ কিছু বলবে না।

গিরিধারী বলতে গেলে পুরানো জমানার লোক; বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে—ব্যাঙ্ক লাইন, সিটি লাইন, বি-আই ইত্যাদি বিদেশী জাহাজ কোম্পানীতে কাজ করার পর এবার দেশী কোম্পানীর জাহাজে কাজ করতে শুরু করেছে। দিশী কোম্পানী বলতে রাজ-কোম্পানীর রাজ-দূত। রাজ-গৌরব, রাজ-শক্তি ইত্যাদি জাহাজে ঘুরে ফিরে কাজ পেয়ে আসছে। স্টুয়ার্ডের কাজ। আগের দিনে স্টুয়ার্ডকে বলত 'বয়'।

জাহাজ সাগরে থাকলে সকাল সাতটায় গিরিধারী আমাকে জাগিয়ে দেয়, দশটা নাগাদ ক্যাবিন সাফসুফ করে, বিছানাটা পাট করে; এগারোটায় লাইম জুস, চারটেতে চা-বিস্কুট দেয়। লণ্ড্রীম্যানের কাছে গিয়ে হপ্তায় দুদিন টাটকা-ধোওয়া চাদর, তোয়ালে, কাপড় জামা নিয়ে আসে। ঠিক সময়ে আমাকে খাওয়ার টেবিলে না দেখলে কাছে এসে খেতে যাবার তাগিদ দেয়। শুধু কি আমার খাওয়া থাকার তদারক করা? সময় পেলেই গিরিধারী আমাকে পুরানো দিনের গল্প শোনায়। যতো সব সমুদ্র জীবনের গল্প। তখন জাহাজে কাজ করতে আসত বেশির ভাগ নোয়াখালি চাটগাঁয়ের লোক—ডেক খালাসি, আগওয়ালা, বয়-বাবুর্চি, সব। চাটগাঁয়ের গফুর ট্যাণ্ডেলই তাকে বলেছিল বটে—আরব সাগরে মাঝে মাঝে নাকি এক অদ্ভুত

ব্যাপার ঘটে ; জাহাজ দেখলেই হাঙররা হাঁ করে ভেসে ওঠে। যখন তখন।

গিরিধারী গফুর ট্যাণ্ডেলকে প্রশ্ন করত—কেন ?

গফুর বলত—খাবার চাইতে, আবার কেন।

'খাবার চাইতে মানে ?' গিরিধারী আবার প্রশ্ন করত।

'ঐখেন দিয়ে জাহাজ গেলে হাঙরদের খাবার দিয়ে যেতে হবে।' হাঙররা যে তাই ভাবে, হাঙরদের ভাবনার উপর জোর দিয়ে গফুর বলত—তা তোমরা জাহাজ নিয়ে ঐখেন দিয়ে যাবে—ওরা পাওনা খাবার বুঝে নেবে না।

গিরিধারী সবে তখন জাহাজ-চাকুরিতে এসেছে ; বয়স মোট চৌদ্দ বছর। ছেলেমানুষ। অবাক হয়ে সে প্রশ্ন করত -'তোমরাও হাঙরগুলোকে খাবার দিয়ে যেতে বুঝি ?'

'হ্যাঁ গো', মরুব্বির মতো গফুর বলত—'হাঙরদের খাওয়াবার ভার ছিল আমারই 'পরে। বাড়িওয়ালা নেয়মমত জাহাজ থামিয়ে দিতেই আমি গোস ছুঁড়ে দিতাম। চাঁই চাঁই বকরীর গোস। হাঙরগুলো কপাৎ কপাৎ করে গিলে ফেলত।

সে সব কথা মনে এলে গিরিধারীর এখন হাসি পায়। তখন গফুররা ক্যাপটেনকে বলত বাড়িওয়ালা, চিফ এঞ্জিনীয়ারকে বড়া-মিস্ত্রী। চিফ অফিসার, সেকেণ্ড অফিসার, থার্ড অফিসার তখন বড়া মালুম, সেইজলা মালুম, আর সেইজলা মালুম। গিরিধারীও তাই বলতে শিখেছিল। এখন কিন্তু অন্যের মতোই বলে চিফ অফিসার, সেকেণ্ড অফিসার। কিন্তু থার্ড অফিসারের উচ্চারণ ওর মুখে কেন যে ঠাড্ অফিসার দাঁড়ায় কে জানে।

গিরিধারী এখন ওঙ্গাকে হাঙরের গল্প বলে ; আর ওঙ্গা কেবলই শুধায়—তারপর ? তারপর ? তারপর আর শেষ হয় না !

সিটি লাইনের হাকিম সারেঙের সঙ্গেও গিরিধারী কাজ করেছে। তা প্রায় চল্লিশ বছর হতে চলল। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। সেই সব দিনের সাংঘাতিক সব কথা নিয়ে হাকিম সারেঙ গল্প বলত

—যুদ্ধের দিনে টরপিডোর ঘায়ে মধ্য সমুদ্রে জাহাজ ডোবার গল্প। মুর্শিদাবাদে ছিল হাকিমের বাড়ি, নবাব নাজিমের মতো মেজাজ। হাকিম বলত, রসদ লিয়ে সবে আমাদের কনভাই আটলান্টিক দরিয়ায় এসেছে। আমাদের পেছনে ছেল খুব বড় একটা জাহাজ। বিটিশ লায়ন। পরের দিন সক্কাল বেলায় পেছনপানে তাকিয়ে দেখি, ব্রিটিশ লায়ন নেই—

গিরিধারী বাধা দিয়ে বলত—নেই মানে? তাহলে কোথায় গেল?

হাকিম বলত—'পানির তলায়, আর কোথায়।'

বলতে গিয়ে হাকিমের গলা ভার হয়ে আসত, ছলছল চোখে হাকিম আবার বলত—'রেইতের বেলায় দুষমনরা টারপিডো মারলে কিনা—বিটিশ লায়ন খালাস।'

'আর লায়নের লস্কররা?' রুদ্ধশ্বাসে গিরিধারী প্রশ্ন করত।

'টারপিডোর মার খেয়ে জাহাজ ডুবলে কেউ বাঁচে,' সারেঙ বলত —'আর বাঁচলেই বা রক্ষা ছেল? গায়ে লাইফ জ্যাকেট বেঁধে পানিতে ভাসতে দেখলে দুষমনরা গুলি করে সাবাড় করে দিত।"

'তাহলে তোমার কনভাইর বাকি জাহাজগুলো বন্দরে গিয়ে পৌঁছতে পেরেছিল?' তখন একই সঙ্গে পনেরো বিশ খানা জাহাজ রসদ নিয়ে সাগর পাড়ি দিত। সঙ্গে থাকত যুদ্ধ জাহাজ। সবদিকে এক একটি কনভয়। কিন্তু কনভয় কথাটিকে হাকিমরা তখন বলত কনভাই। তখন তো আর তেমন লেখাপড়া শেখার যুগ ছিল না।

গিরিধারীর প্রশ্নের জবাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাকিম সারেঙ বলত—'না গো না, তাকি হয়? শেষতক কনভাইয়ের পাঁচখানা জাহাজ বন্দরে ভিড়তে পেরেছিল—বাকি পনেরোখানা খালাস।

টর্পিড়ো-মারা জাহাজের মানুষদের দুর্দশার ছবি তখন সারেঙের চোখে মুখে ভেসে উঠত। সারেঙ বলত—হায় আল্লা! তারপর অনেকক্ষণ আর কথা না বলে চুপচাপ বসে থাকত।

আরও একটি দিনের কথা গিরিধারী আমাকে বলেছিল আসলে

হাকিম সারেঙের মুখে শোনা কথা। জুন মাসের আটলান্টিকে সিটি-অব-ডাবলিন এগিয়ে চলেছে। সন্ধ্যার পরও গরম কাটে নি। তারাভরা আকাশ। লোক-লস্কর নিয়ে হাকিম সারেঙ বসে আছে তিন নম্বর ফলকার উপর। সেই যুদ্ধদিনের কথা হাকিম শোনাচ্ছে তার মানুষদের। টর্পিডোর খায়ে তার নিজের জাহাজই গেছে ডুবে। অনেকে আশ্রয় নিয়েছে লাইফ বোটে। কিন্তু তখনও কিছু লোক জলে হাবুডুবু খাচ্ছে—লাইফ বোটে না আছে জায়গা, না কেউ উঠতে পারছে। ঠিক তখন দেখা গেল আলওয়ালা ভাণ্ডারীকে। কাছেই। লাইফ বোটের দিকে করুণ চোখে চেয়ে দেখছে, পরক্ষণেই ডুবে যাচ্ছে—এবং আবার ভেসে উঠছে। সারেঙ চিফ অফিসারকে অনুরোধ করে বলল বড়া মালুম সাব। জরাসে মেহেরবাণী কর—ভাণ্ডারীকে তুলে নাও।

'ঠিক আছে সারেঙ', গোরা চিফ অফিসার বললে—'নিশ্চয় ভাণ্ডারীকে উঠিয়ে নেব। লেকিন, আর একটা লোক উঠেছে, কি ব্যস, লাইফ বোট ডুবে যাবে। এবার তা হলে বল কি করব?

সারেঙ চুপ। লাইফ বোট আপন গন্তব্যে এগিয়ে চলল। ভাণ্ডারী মাঝ দরিয়ায় হাবুডাবু খেতে খেতে চেয়ে দেখল, লাইফ বোট তাকে ফেলে চলে যাচ্ছে।

পুরানো জমানার লোকদের সঙ্গে কাজ করতে আমার ভালই লাগে—যুদ্ধে না গিয়েও যুদ্ধদিনের অনেক গল্প শোনা যায়। মস্ত লাভ আর কি।

॥ ৬ ॥

ওঙ্গা নামের ইতিহাস তো আগেই বলেছি। আগে ওঙ্গা বললে ও রেগে যেতো ; ভাবত, কি বিচ্ছিরি নাম। এখন যেন একটু করে নামটি ভাল লাগছে। ও বেশ বুঝতে শিখেছে ; যারা ওঙ্গা বলে ডাকে, তারা ভালবেসেই ডাকে।

আমরা যখন ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিলাম ওঙ্গা তখন ক্রুদের মেস-রুমে গিয়ে হাজির হয়েছিল। এঞ্জিন সারেঙ রাবণ দত্ত আপন ব্রেকফাস্টের ছোলা কারি, ডিমভাজা, সেঁকা-রুটির মোটা ভাগ দিয়ে এক গাল হেসে বলেছিল—জানলে সোনামনি, সেলুনের ব্রেকফাস্টের চাইতে এর আস্বাদ অনেক বেশি। খেয়েই দ্যাখো না—

সারেঙ আজ তার পাওনা র‍্যাশনের মাখনটুকু ছোলার ডালে মিশিয়ে দিয়েছিল। স্বাদ না হয়ে পারে? আজ যেন সারেঙের বাড়িতে অতিথি এসেছে তাই ভাল খাওয়ার দিন। ওঙ্গা তখনও ইতস্তত করছে দেখে রাবণ দত্ত বলল—'একটু মুখে দিয়েই দ্যাখো না ক্যানে—মা বাবা কিছু বলবে নি।'

শুধু কি ব্রেকফাস্ট? রাবণ দত্ত আজ ডাল, আলু ভাজা, কৈ মাছের পাতুড়ি দিয়ে ওঙ্গাকে লাঞ্চ পর্যন্ত খাইয়ে দিয়েছে। খেতে ওর কি ভালই না লেগেছে/সুপ, স্যালাড, স্টেক কি আর এর কাছে লাগে! ওদিকে সব কথা কিন্তু ঠিক ঠিক মা-বাবার কানে গিয়ে পৌঁচেছে। কি আর করবে—শুনে তারা খুব করে হেসেছে। সারা জাহাজের মধ্যে একটি মাত্র বাচ্চা। ফুটফুটে। ঝরঝরে। সবাই ভালবাসে। ডেকে কথা বলতে চায়। খাওয়াতে চায়। ওঙ্গারও তেমন আপত্তি দেখা যায় না।

'তোমার মেয়ের যে জাহাজী রুচি', হাসতে হাসতে অপলা মুখার্জী বড়া সাবকে বলে—'দেখে নিও, ওঙ্গা শেষ পর্যন্ত জাহাজেই চাকুরি নেবে—ওঙ্গা হবে ভারতের জাহাজে প্রথম মহিলা কাপ্তান!'

ওঙ্গা আর তার মা আসলে জাহাজে প্যাসেঞ্জার। বিনা ভাড়ার যাত্রী। বাকি সবাই কাজের লোক। ওঙ্গা সবাইকে বলে 'আঙ্ক্‌ল্‌, ক্যাপটেন আঙ্ক্‌ল্‌, রেডিও আঙ্ক্‌ল্‌, চার-সাব-আঙ্ক্‌ল্‌ শুধু চিফ অফিসার মিটু আঙ্ক্‌ল্‌। আশ্চর্য, আমাকে বলে রাজেশ দাদা।

জাহাজটা বাড়ি নয়, কিন্তু এখানে অনেক ঘর আছে—ঘরে ঘরে যেন অনেক রহস্য আছে। জাহাজ জুড়ে অবাক হয়ে দেখবার মতো কত কিছু আছে। বোধ হয় তারই টানে ওঙ্গা ভোর সকালে মা-বাবার কাছ থেকে বাইরে চলে আসে, খানিক সময় জাহাজে টহল দেয়—তিন আর দোতালা ভেঙে মেইন ডেকে যায়। কখনও চলে যায় এঞ্জিন সারেঙ, থার্ড কুক, নয়তো ডেক ট্যাণ্ডেলের ক্যাবিনে; কিংবা অফিসার ডেকে গিয়ে ঘুর ঘুর করে। রাজহংস কলকাতায় থাকার সময় ওঙ্গা জাহাজে এসে মা-বাবার সঙ্গে দিন দশেক কাটিয়েছিল। তারপর রাজহংস কলকাতা ছেড়েছে। তাও দুদিন হয়ে গেল। এরই মধ্যে ওঙ্গা জেনে ফেলেছে কার কখন ডিউটি, কে কখন ঘুমুতে যায়, কখন ওঠে। কার সঙ্গে কখন দেখা হবে। জাহাজের আশ্চর্য জগতে এসে বাড়ির সঙ্গি সাথীদের ওঙ্গা প্রায় ভুলেই গেছে। এবার নতুন জগতের নতুন বন্ধুদের সঙ্গে রোজ দেখা-সাক্ষাৎ না করলে চলে, নাকি তাদের খোঁজ খবর না নিলে ভাল দেখায়।

রাজহংসর বিস্ময় অপলা মুখার্জীর কাছেও কিছু কম নয়—এ যেন মস্ত একটি আটতলা বাড়ি; চার চারটি তলা রয়েছে জলের নিচে, শহরে বেসমেন্টের তলার ঘরের মতো। জাহাজে জলের নিচেকার জায়গা দখল করে যাচ্ছে এঞ্জিন ঘর, আর মাল ভরাটের ফলকাগুলো। রাজহংস মস্তবড় জাহাজ, লম্বায় পাঁচশ দুই ফুট, পাশে ষাট ফুটের কিছু বেশি। গঙ্গার বিভিন্ন জায়গায় যে সব খেয়া নৌকা যাত্রী পারাপার করে তার অন্তত তিনটি নৌকা জলহংসর উপর আড়াআড়ি রাখা যায়। এখানে কল চলছে, প্রপেলার ঘুরছে। জাহাজেই বিজলী তৈরী হচ্ছে—রাজহংস এয়ারকণ্ডিশন চালিয়ে আলো জ্বালিয়ে জলের

উপর তেলের মতো ভেসে চলেছে। কেউ কি আর দেখে বুঝতে পারে, কে চালায়, রাজহংস কিসে চলে!

অপলা মুখার্জীর কাছে খুব নতুন ঠেকছে জাহাজের ভাষা—আগের দিক কেন আগিল, পেছনের দিক কেন পিছিল বুঝতে খুব অসুবিধা হয় না; কিন্তু রশি কি করে হাসিল হয়, ফলকার সঙ্গেই বা ফলের সম্বন্ধ কোথায়!

জাহাজের রান্নাঘরকেও রসুইখানা বলে না—সবাই বলে গ্যালী। রাজহংস জাহাজে আছে তিনটি গ্যালী—ডেক-ক্রু, এঞ্জিন-ক্রু, অফিসারদের জন্য রান্না হচ্ছে আলাদা আলাদা গ্যালীতে। রান্না-করা লোকদের পদবীও আলাদা। ক্রুদের রান্না করা লোককে বলে ভাণ্ডারী। অফিসার গ্যালীতে রান্না করে কুক—চিফ কুক, সেকেণ্ড কুক, থার্ড কুক।

কলকাতা থেকে রাজহংস প্রথমে যাবে বাংলাদেশের চালনায়; তারপর সৌদি আরব হয়ে ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, জার্মানী ইত্যাদি দেশে। আবার কলকাতায় ফিরতে প্রায় চারমাস সময় লেগে যাবে। জাহাজের রান্না করার মাল মশল্লা আমরা কোথায় কিনব? বেশির ভাগ কলকাতায়—চাল, ডাল, তেল, নুন, মশল্লা, আটা, সুজি, পাঁপড়, জাম, জেলি, চাটনী ইত্যাদী দিন চারেক আগেই জাহাজে এসে গেছে। এসব জিনিস তো নষ্ট হবার নয়। শুধু মাছ, মাংস, ডিম, ফল, তরিতরকারি দেশে দেশে কিনে নিলেই হবে। অবশ্য বাজারে গিয়ে আমাদের কিছুই কিনে আনতে হবে না এজেন্ট সব ব্যবস্থা করবে।

জেটি থেকে গ্যাঙওয়ে দিয়ে উঠে এলে মেইন ডেক। তার আরও দুই ডেক নিচে স্টোর-রুম। সবরকম রসদ জাহাজে আসার পর অপলা দেবী স্টোরে গিয়ে একনজর দেখে এসেছেন, জাহজের কোথায় সব খাওয়ার জিনিস থাকে তা নিজে চোখে দেখে কৌতূহল মেটাতে।

'সাবধান হয়ে এগোতে হবে, মেমসাব', মিটরুমের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ভিক্টর ব্র্যাগাঞ্জা বলেছিল। ব্র্যাগাঞ্জা রাজহংসর চিফ স্টুয়ার্ড, সবার খাদ্য যাওয়া ও রসদপানির ভার তার উপর।

চিফ স্টুয়ার্ডের সাবধান করার কারণ বুঝতে অপলাদেবীর দেরি হল না। আসার পথে তিনি দেখতে পেলেন, কোথাও এক ইঞ্চি জায়গা খালি পড়ে নেই—এমনকি মিটরুমের সরু পথের দুধারে ঝুড়ি, বাক্স, ওজনের যন্ত্র ইত্যাদি কত কি পড়ে আছে। একটু অসাবধান হলে আঘাত পাবার ভয় আছে। অবশ্য জাহাজের সর্বত্র।

মিটরুম দেখে অপলা মুখার্জীর চক্ষুস্থির—মুণ্ডু কাটা ছাল-ছাড়ানো আস্ত আস্ত পাঁঠা খাশি ঝুলছে; ট্রেতে সাজানো মুরগীও রয়েছে অনেক সব ছাল-ছাড়ানো। তাকের পর তাক জুড়ে রয়েছে মাছ—সুরমাই, ভেটকী, গুরজালী, পমফ্রেট, ম্যাকারেল, ভাংড়া ইত্যাদি। ঘরময় বরফ জমে গেছে—ঘন কুয়াশা আলো ভেদ করে ধোঁয়ার মত উড়ছে। গরম কাপড় না পরে এখানে ঢোকা যায় না। কারণ তাপমাত্রা এখানে মাইনাস সাত ডিগ্রী।

অপলাদেবী সুধালেন—'মুরগী খাসি মিলে কতটা মাংস মিটরুমে রয়েছে।'

ব্র্যাগাঞ্জা বলল—'সাড়ে, চারশ কেজি মেমসাব। একমাসের খোরাক।

'আর মাছ, মাছ কতটা?'

'দু'শ দশ কেজি—রোজ সাত কিলো হিসাবে একমাসের।'

সব্জীঘরে ঢুকে মেমসাব এবার দেখলেন, পাতিলেবু রয়েছে চার হাজার। আর ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, গাজর, ভিণ্ডী, ঝিঙে, শশা, লেটুস ইত্যাদি মিলে কাঁচা সব্জী থরে থরে সাজানো রয়েছে, রোজ পনেরো কেজি হিসাবে সাড়ে চারশ' কেজি। প্লাস চার ডিগ্রীর সব্জী ঘরে। চার হাজার মুরগীর ডিম প্লাস এক ডিগ্রী। আর আপেল, নাসপাতি, আনারস, পেঁপে ইত্যাদি ফল রাখা হয়েছে দুই ডিগ্রী তাপমাত্রায়।

অপলা মুখার্জীর মনে হল, এক নতুন জগতের দরজা যেন তার সামনে খুলে গেছে।

একটা ঘরে ডবল তালা ঝুলছিল, শিল মোহর করা কাগজ সাঁটা

ছিল দরজায়। ব্র্যাগাঞ্জা জানিয়ে দিল, 'ওটা কাস্টম্‌স্‌ লকার।'

'ওখানে কি থাকে?' মেমসাব এবার প্রশ্ন করলেন।

'সিগারেট, বীয়ার ইত্যাদি' ব্রাগাঞ্জা বলল।

'তাহলে মেনন সাহেব এত সিগারেট এইখান থেকে কিনে খান—অপলা মুখার্জী অনেকটা স্বগতোক্তি করলেন।

ব্র্যাগাঞ্জা কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না!

॥ ৭ ॥

গঙ্গাসাগরে নোঙরে দাঁড়িয়ে রাজহংস এক টুকরো দুলছে—তারমাথা রয়েছে কলকাতার দিকে। এখন ভাঁটার সময় কিনা! সাগরের তীরের দিকে কিংবা মধ্যনদীতে যেখানেই জাহাজ নোঙর করুক, আস্তে আস্তে তার মাথাটি ঘুরে যায়, ঠিক যে দিক থেকে জলের ধারা বয়ে আসে, সেই দিকে। সে ভাঁটার টানই হোক, কিংবা জোয়ারের জোরই হোক।

রাজহংস থেকে মোটে দেড় মাইল দূরে ছিল লাইট হাউস। নাম তার 'সাগর লাইট হাউস'—অনেকটা গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের মতো। গোল করে সাদা আর কালো রং পর পর দেগে দেগে গোটা লাইট হাউসটি রং করা। সূর্য অস্ত গেলে লাইট হাউস আলো দেখতে শুরু করে; তিন সেকেণ্ড পর পর সেই আলো জ্বলে আর নেভে। আবার সূর্য ওঠা পর্যন্ত পনেরো মাইল দূর থেকে দেখা যায় এই জ্বলা-নেভা আলো।

কতবার আলোটা জ্বলছে ওঙ্গা তার হিসেব রাখতে শুরু করেছিল! শেষ পর্যন্ত 'ধুর' বলে ছেড়ে দিল। যে আলো ঘণ্টায় বারোশ বার জ্বলে কর-গুণে তার কি আর হিসাব রাখা যায়!

পৃথিবীর সব দেশেই লাইট হাউস রয়েছে সাগরের কূলে, কিংবা নদীর ধারে। বন্দরে ঢুকতে কিংবা কোন বন্দরের পাশ দিয়ে যেতে লাইট হাউসের আলো মিলিয়ে দেখে বুঝতে পারা যায়, জাহাজ ঠিক পথে চলছে কিনা। পাইলট বইয়ে, এবং চার্টে লাইট হাউসের সব

বিবরণ লেখা থাকে। মিলিয়ে দেখতে কোন অসুবিধা নেই। সমুদ্রে যারা মাছ ধরতে যায়, লাইট হাউসের আলো তারা ভাল করে লক্ষ্য রাখে—যাতে ফেরার পথ না হারায়।

ভোর সকালে নোঙর উঠিয়ে রাজহংস আবার চলতে শুরু করেছে সাগরের দিকে। পনেরো মাইল পর চলার পথে দেখা গেল একটি নোঙর করা লোহার নৌকো। লাল রং করা; তার গায়ে লেখা আছে 'বিউমনস্ গাট'। দু'ধারেই জল খুব কম—নৌকাটি তারই নিশানা। অল্প দূরে চড়ার আভাস স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে—চড়ার ইঞ্চিখানেক উপর দিয়ে জল তির্ তির্ করে বয়ে চলেছে, অথচ চারদিক দেখতে সমুদ্রের মতো—শুধু জল আর জল। আসল সাগর কিন্তু আরও ত্রিশ মাইল দূরে।

শেষ পর্যন্ত এবার আমরা স্যাণ্ড হেড্সে এসে গিয়েছি। সাদা রং করা পাইলট জাহাজ অদূরে দাঁড়িয়ে একটু করে দুলছে। বঙ্গোপ-সাগরে এই হচ্ছে আমাদের পাইলট স্টেশন, গঙ্গা নদীর আসল মোহনা — পলিমাটি, বালি জমে জমে এখানে আর চড়া পড়ে না। এবার সব জাহাজ থেকে পাইলট নেমে যাবেন; যে সব জাহাজ কলকাতায় যাবে তারা এইখানে পাইলট পাবে।

দুঃখের বিষয় আজ সমুদ্র বড় অশান্ত। বড় বড় ঢেউ খেলছে। ঢেউর মাথায় বসে সমুদ্র পাখিরা ছন্দে ছন্দে উঠছে আর নামছে। এ যেন নাগরদোলার ঢেউ। চঞ্চল সাগরে রাজহংসও খুব দুলছে। রাজহংসের অনেক লোকই পুরানো জাহাজী—ওঙ্গা, তার মা, ফিফথ এঞ্জিনীয়ার পরমেন্দর সিং অরোরা, ফায়ারম্যান (আগওয়ালা) আব্দুল মান্নান, ডেকের সী-ম্যান হর্ষ চৌধুরী জীবনে এই প্রথম সমুদ্র দেখছে। অপলা মুখার্জীর মাথা ঘুরতে শুরু করেছে, সমুদ্রের দিকে ফিরে চাইতে পর্যন্ত তার ভাল লাগছে না। ওঙ্গা নির্বিকার—ভাবছে এ কোথায় এলাম; গাছপালা, বাড়িঘর কিছুই নেই; চারদিকে শুধু জল আর জল।

পাইলট জাহাজ থেকে বড় একটা মোটর বোট নামিয়ে দেওয়া

হয়েছে, রাজহংসর পাশে মোটর বোট এসেও গিয়েছে। রাজহংসর গায়ে বেশ মজবুত একটি দড়ির মই ঝুলছে। পাইলট এই মই বেয়ে দশ ফুট খানেক নেমে গেলেন ; কিন্তু মোটর বোটটি বেদম দুলছে—জাহাজের গায়ে মইয়ের কাছাকাছি মোটেই দাঁড়াতে পারছে না। নেমে গিয়ে বোটে পা রাখতে না পেরে পাইলট ফিরে এলেন।

আকাশের অবস্থা ভাল নয়। মেঘলা আকাশ থেকে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বেগে বাতাস বইছে। ঢেউর সাগরে মোটর বোটের অবস্থাও বড় করুণ দেখাচ্ছে—একজন মাল্লা হাল ধরে বসে সামনে-পাশে ভয়ের চোখে তাকিয়ে দেখছে এ যেন কোথায় যেতে হবে ঠিক বুঝতে পারছে না। আর তিনজন মাল্লা আপন আপন জায়গায় খুব হুসিয়ার হয়ে বসে যেন যার যার ভগবানকে ডাকছে। মোটর বোট ফট্ ফট্ শব্দ করে ঢেউয়ের মাথায় উটছে, আবার ঢেউয়ের তালে নেমে আসছে! সমুদ্র যেন ওদের সঙ্গে খুব মজা করছে—ঝাপটামারা জল ছিটিয়ে ওদের ভিজিয়ে দিচ্ছে।

সমুদ্র কিছু শান্ত হতেই পাইলট নেমে গেছেন। আমরা চলেছি এগিয়ে চালনা বন্দরের দিকে। চালনা বাংলাদেশের খুলনা জেলায়। দেশ বিদেশের জাহাজ বুকে ঠাঁই দিয়ে পুশুর নদী দিব্যি তার জলে বন্দরের গৌরব সৃষ্টি করেছে—তোমরা গিয়ে তরী ভেড়াও। কিন্তু স্যাণ্ড হেড্স ছাড়ার পর বঙ্গোপসাগরে আমাদের ঘণ্টা দশেক চলতে হল। তারপর এলাম পুশুরের মোহনায়।

বাংলাদেশী পাইলট আসতেই আমরা পুশুর নদীপথে এগিয়ে চলেছি। দুদিকেই সুন্দরবনের খানিক আভাস দেখতে পেলাম। নদীর পার থেকে আবার অনেক খাল বের হয়ে মাটির বুক চিরে বনের মধ্যে এগিয়ে গেছে। ডিঙি নৌকা আর জাল নিয়ে ছেলেরা খাল বেয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। চিংড়ি মাছ আর কাঁকড়া ধরতে। খালগুলো আবার বাগদা চিংড়ি, গলদা চিংড়ি, বোম্বাই-সাইজ কাঁকড়ার খনি। পারশে, গুরজালি, ভেটকি মাছও খালের জল থেকে জেলেরা ধরে আনে।

সুন্দরবনের বাঘের কথা আর কে না জানে—কিন্তু তাদের দেখা না পেয়ে সত্যি সবারই মন খারাপ। ওঙ্গা তার মায়ের আঁচল ধরে দাঁড়িয়েছিল—বাঘ যদি দেখাই যায়,আঁচলে মুখ লুকিয়ে দেখলেই চলবে—তা হলে বাঘ আর ওকে দেখতে পাবে না। ওঙ্গা এবার বায়না ধরল বাঘ কেন আসছে না তার কারণ আমাকে বলতে হবে। আমি বললাম বাঘ কি আর এখন সুন্দরবনের খালধারে ঘুরে বেড়াতে পারে, নাকি জল খেতে আসতে পারে ? জেলেরা যে মন্ত্র পড়ে তাদের হটিয়ে রেখেছে, যাতে নিজেরা নির্ভাবনায় মাছ ধরে ফিরে যেতে পারে।

কিন্তু বাঘেরা যদি মন্ত্র না মানে, খালধারে এসে হানা দেয়—ওঙ্গা শুধায়।

তা হলে ? জেলেরা তাহলে বাঘের ল্যাজ ধরে বোঁ বোঁ করে ঘুরিয়ে বাঘগুলোকে খালের জলে ডুবিয়ে মারবে। এই কথা শুনে ওঙ্গা বলল—বাঃ,—তা হলে তো বেশ মজা হবে।

পুশুর নদী বেয়ে ঘণ্টা তিনেক চলার পর আমরা এবার নোঙর ফেলেছি। বন্দর বলতে এই। এখানে জাহাজ নিয়ে আর কেনারায় ভেড়ে না। অনেকগুলো গাদা বোট এসে রাজহংসের হু'পাশে ভিড়েছে ; এন্তার পাটের গাঁট, চায়ের পেটিতে বোটগুলো ভর্তি। এবং শুধু রাজহংস নয়, আমাদের আগে-পিছে গোটা দশেক দেশী-বিদেশী জাহাজ রয়েছে—তাদের গায়ে বাঁধা গাদা বোটেও রয়েছে চা, পাট, চিংড়ি মাছ, ব্যাঙের ঠ্যাঙ্, জাহাজে ভরাট হয়ে চালান হবে জাপান, আমেরিকা, জার্মানী ইত্যাদি দেশে। কিন্তু আমরা অবাক হয়ে দেখছিলাম জাহাজ-গাদাবোট,ডিঙি নৌকা আর মাল্লা মজুরের কোলাহলে জমজমাট বন্দরের চেহারাটি। বেশ ভালই লাগছিল। মধ্য নদীতে জাহাজ ভিড়িয়ে এমন এলাহি কারবার আজকাল কে কোথায় আর দেখতে পায় !

আমরা এই মাত্র এসেছি বলে আমাদের জাহাজের গায়ে হাট লেগে গেছে—আজ পাশের গাঁ থেকে নৌকো বেয়ে লোক এসেছে অনেক রকম জিনিস বেচতে, চিংড়ি, ইলিশ, ভেটকি মাছ, জ্যান্ত মুরগী, জ্যান্ত পাঁঠা; কলা, পেঁপে, ডাব, সব্জী, ঝুনো নারকেল, মধু ইত্যাদি মিলে সে

এক বড় বাজার। একেবারে নতুন বাজার। জিনিসপত্রের পশরা নিয়ে ছেলে ছোকরারা জাহাজে উঠে পড়েছে; তাদের কাঁধের ঝুড়িতে রয়েছে মাছ, ডিম, নয়তো কলা। হাঁক ডাক করে ছোঁড়ারা বলছে নিন না সাহেব, পয়সা দিয়ে কিনতে হবে না। ঢাউস সাইজের দুটো গলদা চিংড়ি হাতে তুলে একটি ছেলে আমায় বললে এক প্যাকেট বিলেতি সিগারেট দিলেই চলবে। চিংড়ি দুটোর ওজন ছিল পাঁচশ গ্রামের মতো; এক প্যাকেট স্টেট একপ্রেসের দাম মোটে পাঁচ টাকা। সিগারেট বাইরে নিয়ে ওরা বিক্রী করবে বাংলাদেশী তিরিশ টাকায়, যা আমাদের প্রায় বারো টাকার সমান। গরিব বেচারাদের এই যা লাভ।

সব জিনিস এই রকম করেই বিকি-কিনি হচ্ছে— ডাব নিয়ে সবাই ক্যাবিন ভরে ফেলেছে। মাছগুলো ফ্রিজে চালান হচ্ছে। বীয়ার সিগারেট ইত্যাদির বিনিময়ে পাঁঠা মুরগীও অনেকের কেনা হয়ে গেছে। দরকার না থাকলেও এখানে অনেকেই অনেক কিছু কেনে। কিনতে ভাল লাগে। এ যেন রূপকথার দেশ এমনটি তো আজকাল আর কোথাও দেখা যায় না।

জাহাজে কাজ করার একটি মজা আছে—অনেক দেশে যাওয়া যায়, অনেক দেশের অনেক আশ্চর্য জিনিস দেখা যায়। চালনায় এসেও আমরা এক ফাঁক মতো বেরিয়ে পড়লাম। মোটর গাড়ি চেপে খুলনা শহরে যেতে এক নতুন জিনিস দেখলাম, চিংড়ি মাছের চাষ। সড়কের দু'ধারেই। দু'মাইল চওড়া, মাইল দশেক লম্বা এক বিরাট জলাভূমি— তাতেই চলছে চিংড়ি চাষ। বছরে ছ' সাত মাস। বাকি সময়ে ঐ জমিতে হচ্ছে ধান গাছ। আশ্চর্য নয়, বাংলাদেশ ফি-বছর একশ' কোটি টাকার চিংড়ি মাছ বিদেশে রপ্তানী করে। অবশ্য খুলনা ছাড়া বাংলাদেশের আরও অনেক জায়গায় চিংড়ি চাষ হয়।

অপলা মুখার্জী পাটক্ষেত দেখে তো অবাক। জীবনে এই প্রথম তার পাটের চাষ দেখা। ঝকঝকে রাস্তার দু'পাশে পাটের ভুঁই ফসলবুকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বাঁশ বনে ঘু ঘু ডাকছে; গাছের

মাথায় ডাব-নারকেলের উপর বসে তখন একটা হলুদ পাখি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখছে, ঠোঁট দিয়ে ডাব খাওয়ার কোন কায়দা করা যায় কিনা! তার মস্তবড় ল্যাজটি ঝুলতে দেখে ঝোপের আড়াল থেকে এক দুষ্টু ছেলে ছুঁড়ল একটা ঢিল। পাখিটা ভীষণ প্রতিবাদ করে উড়ে যেতে যেতে বলল— পাজি ছেলে, বদমাস ছেলে। ওঙ্গা আর তার মা-বাবা তখন শস্য-উদার মাঠ-ঘাট, বিল পুকুরে শাফলা দল, পদ্মবনে হাঁসের মেলা দেখে দেখে মনে মনে বলছিলেন— সোনার বাংলাই বটে।

আমরা তখন বাগেরহাট এলাকা ছাড়িয়ে গিয়েছি। বাগেরহাটের রাড়ুলি গাঁয়ে ছিল বিজ্ঞানাচার্য পি-সি-রায়ের বাড়ি। আমাদের রাড়ুলি যাবার আগ্রহের কথা শুনে ড্রাইভার বললে—'এই বর্ষার দিনে ওখানে মোটর গাড়ি চলবে কিনা সন্দ করি স্যার।' সুতরাং রাড়ুলি যাবার কথা আমাদের ভুলতে হল।

খুলনা শহর দেখে কি ভালই লাগল—সুন্দর রাস্তাঘাট, গাছে গাছে ঝুলন্ত ডাব, রাস্তায় রাস্তায় নিত্যনতুন দালান কোঠা— সব মিলে কেমন একটা বাংলাময় উদার ভাব। এই শহরের কাউকেই আমরা চিনি না, আমাদের কথা ওরাও কেউ কখনও শোনে নি। তবু আমাদের মন বলল— এই শহরে যারা বাসকরে তারা বাঙালি,আমাদের বড় আপন জন! এমন কথা অবশ্য জীবনে আমাদের অনেকবারই মনে হয় বিশেষ করে সাগরে সমুদ্রে ফিরে জাহাজ বন্দরে গেলে।

খুলনা দেখতে গিয়ে কি আর ভাবতে পেরেছিলাম, আমরা দক্ষিণ দিহিতে যাবো। সেখানে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের শ্বশুর বাড়ি দেখব। কাজী দীনায়েৎ আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন। পাশের গাঁয়ে তার বাড়ি কিনা—পাইগাম কসবায়।

ভেবেছিলাম, রবীন্দ্রনাথের শ্বশুর বাড়ি যখন, আশ্চর্য গোছের একটি কিছু না হয়েই যায় না। কিন্তু তা ঠিক নয়। বিঘে ছয়-সাত জমির মাঝে ছোট একটি দালান, একশ বছরের বুড়োর মতো জরায় পাওয়া। কে জানে কে গেঁথেছিল দোতালা এই দালানটি, কবে, কোন্ কালে। এবারের পঁচিশে বৈশাখেও এখানে রবীন্দ্রজন্মের উৎসব হয়েছে।

ঢাকা থেকে তখন জ্ঞানীগুণীরা এসেছিলেন সেই উৎসবে যোগ দিতে। আর তখনই বাংলাদেশ সরকার বলেছেন—দক্ষিণদিহির এই বাড়িতে রবীন্দ্রস্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা তাঁরা করবেন।

দক্ষিণদিহির পর অনেক সুপারি বন, বেতুলের ঝোপ, আমবাগান পাশে পাশে রেখে আমরা হাঁটতে লাগলাম। কাঁচা রাস্তায়। রাস্তার ধারে মাটি-কাটা থাকে—তখন বাঁশবনের ছায়া হেলে পড়েছিল। আর জলের মধ্যে কৈ-ল্যাটা-মাগুর মাছেরা টুপ্‌টাপ্ করছিল। ওপাশের পোড়ো বাড়ির এক বুড়ো নারকেল গাছের আড়াল থেকে যেন তক্ষকের ডাকও আমাদের কানে এসেছিল। আর তাই বোধহয় একটা লাল মোরগ কেবলই চেঁচিয়ে বলছিল—কংসরে তুই সর্!

আমরা এবার পাইগাম কসবায় পৌঁছে গিয়েছি। দীনায়েতের বাড়িতে দুপুরের খাবার তৈরীও ছিল। খাবার তো নয়, ভোজ—গরম গরম ভাত, সরষে-ইলিশ, পাঁঠার ঝোল। শেষে দই-মিষ্টি। খেয়ে সবাই হেউ ঢেউ। এমন খাবার কি কারও রোজ জোটে।

কাজী দীনায়েত অনেক বই-পড়া ছেলে। লেখা পড়ায় তার দারুণ রুচি। কাজী আজার হোসেন তার আপন চাচা। কবি ব'লে বাংলাদেশে তাঁর খুব নাম। দীনায়েত খুব শিক্ষিত পরিবারের ছেলে।

দক্ষিণদিহি আর পাইগাম কসবার আশপাশে রয়েছে আরও কটি গ্রাম—ঘুগনীপাড়া, রাজঘাট, ফুলতলা, দামোদর। সবগুলো গ্রাম দেখে এক আশ্চর্য কথা আমাদের মনে হল। মনে হল,এই গ্রামগুলোকে আমরা চিনি। তাদের সঙ্গে আমাদের অনেক যোগাযোগ আছে—অনেক, অনেক দিনের। তা কখনও ভোলা যায় না!

ঘুগনীপাড়ার আবদুল আওয়াল এক কচি ছেলে—জসিমুদ্দিনের মতো ধান-কাওনের মাঠে মাঠে কবিতা কুড়োয়। ফুলতলার রসগোল্লা আনিয়ে আওয়াল আমাদের খাইয়ে দিল, বলল—ঘুগনীপাড়ায় এলে এই রসগোল্লা খেতে হয়!

খুলনার আবদুর সালাম বলেছিল—এখানকার মাখা সন্দেশ না খেয়ে যেতে নেই!

॥ ৮ ॥

চালনায় মোট পাঁচ হাজার টন বাংলাদেশী মাল ভরাট হয়েছে রাজহংস জাহাজে—আটশ টন চা, দু'শ টন চিংড়ি, চার হাজার টন পাট, ইংলণ্ড, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড এবং পশ্চিম জার্মানীর জন্য। বাংলাদেশে শ্রমিকের গোলমাল তেমন নেই, সুতরাং ছদিনের মধ্যে সব কাজ শেষ হয়ে গেল। বন্দর হিসাবেও চালনা বেশ ভালই বলতে হবে! স্রেফ নদীর জলে জাহাজ দাঁড়িয়ে থাকে বলে কোটি কোটি টাকা খরচা করে জেটি তৈরী করতে হয় নি। চালনার রাহা-খরচও বেশ কম!

চালনা থেকে আমরা চলেছি কাকিনাড়ায়, হেড আপিসের হঠাৎ-হুকুমে। কাঁকিনাড়ায় আগে আমাদের যাবার কথা ছিল না। হর্ষ চৌধুরীর আনন্দ আর ধরে না। সে ভাবছে, কাঁকিনাড়া থেকে নৈহাটি আর কদ্দূর? দিব্যি গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসা যাবে। 'সারেঙদা' অরুণ মিত্রকে হর্ষ গিয়ে বলল—'ভোর সকালে আমাকে একটু ডেকে দেবেন কিন্তু।'

'শুধু তোমাকে কেন, সবাইকে ডাকতে হবে,' সারেঙ জানিয়ে দিল 'কাল তো পাঁচটাতেই স্টেশন।'

খুশি হয়ে হর্ষনাথ ভাবে, তা হলে অনেকেই স্টেশনে যাবে। ঠিক কাল সকালেই সারেঙদার কাছে ছুটি চাইতে হবে বাড়ি যাবার জন্য। কাকিনাড়ায় যেতে হাওড়া পুলে যে জাহাজের মাস্তুল ঠেকে যাবে সে খেয়াল আর তার হল না।

স্টেশন! ঠিক পাঁচটায় অরুণ মিত্র হেঁকে বলল! লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে হর্ষ চৌধুরী দেখতে পেল, আর সবাই কাজের পোশাক পরে তৈরী এবং দুই দলে ভাগ করা। আগিলের দল সারেঙের সঙ্গে এগিয়ে চলল।

এবার পিছিলের দলকে মজিদ ট্যাণ্ডেল চেঁচিয়ে বলল, 'টেসিন, চার লম্বর ~~কাকাবাবু :~~ লাইসিন হবে।' অর্থাৎ জাহাজের পেছনের

দলকে ট্যাণ্ডেলের সঙ্গে চার লম্বর ফলকার কাছে চলে যেতে হবে। সেখানে রশি, লোহার তার ইত্যাদি দিয়ে অনেক ল্যাশিং অর্থাৎ বাঁধা ছাদার কাজ হবে, যাতে খোলা সাগরে হাওয়া লাগলে ডেকের পরে কিছু না গড়ায়; বিপদ না বাড়ে। হর্ষ চৌধুরী সারেঙের দলে পড়েছে দেখে ট্যাণ্ডেল খুশি। ট্যাণ্ডেল ধরে নিয়েছে হর্ষ তেমন কাজেব ছেলে নয়, কারণ সে লেখাপড়া জানা!

অ্যাগিলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হর্ষ বলল—কোন্ স্টেশনে যেতে হবে সারেঙদা, কাঁকিনাড়ায়, তাই না?

সারেঙ মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। জাহাজে নতুন এসে তারও একদিন মনে হয়েছিল, স্টেশন বললে রেল স্টেশন ছাড়া কিছুই নয়। জাহাজে স্টেশন বলতে যে কাজের জায়গায় হাজির হওয়া, সারেঙ এবার তা হর্ষ চৌধুরীকে ভাল করে বুঝিয়ে দেয়।

ডেকে উঠে হর্ষ চৌধুরী তো অবাক—সামনে যে অনন্ত সমুদ্র! সারেঙকে সে শুধায় 'আমরা কাঁকিনাড়ায় যাচ্ছি বটে তো?'

'কিন্তু সে তো বিকেলে, 'সারেঙ জানিয়ে দেয়।'

'জাহাজ এখনও তবে গঙ্গায় এসে কেন পৌঁছায় নি?' হর্ষ আবার প্রশ্ন করে।

'ও ছেলে', সারেঙ হেসে বলে—'এ তোমার বাড়ির কাছের কাঁকিনাড়া নয়, অন্ধ্র প্রদেশের কাকিনাড়া, বুঝলে বুদ্ধিমান। বানানটি লক্ষ্য করতে হয়!'

রাজহংস শেষ পর্যন্ত কিন্তু কাকিনাড়ায় গিয়েও ভিড়ল না, হেড অপিসের নয়া বেতারবার্তা পেয়ে বাঁধল গিয়ে মাদ্রাজের ঘাটে। অবশ্য আগে নোঙর করতে হল ডকের বাইরেকার সাগর জলে। মাদ্রাজ ডক কলকাতার মতো মাটি কেটে জল ঢুকিয়ে তৈরী করে তোলা নয়, যাকে বলে স্বাভাবিক পোতাশ্রয়—একটুকরো সাগরের তিনদিকে দেয়াল গেঁথে জাহাজ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে. একদিকে সাগরতীর তো আছেই।

পাইলট না আসা পর্যন্ত সবাই বেশ তামাসা দেখছিল। তখন জাহাজের কাছে অনেক ক্যাটাম্যারণ এসে ভিড়েছে। সে এক বিচিত্র নৌকা—দু'তিনটি গাছের গুঁড়ি একসঙ্গে পেরেক দিয়ে গেঁথে তৈরী করা। পাটাতন নেই, ছই নেই। বৈঠার টানে কলার ভেলার মতো ভেসে ভেসে চলে। এই ক্যাটাম্যারণ নিয়ে নেংটিপরা ছেলেরা চারপাঁচ মাইল বাহির সাগর পর্যন্ত মাছ ধরতে যায়।

সেকেণ্ড কুকুই খেলাটা শুরু করল। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে একটা পাঁচপয়সার কয়েন জলে ছুঁড়ে দিল। দশ-বারো বছরের অনেকগুলো ছেলে আপন আপন ছোট্ট ক্যাটাম্যারণে তৈরী হয়েই বসে ছিল, এবার সবাই দিল জলে ঝাঁপ। একটা ছেলে জলের গভীর থেকে পয়সাটি দিব্যি কুড়িয়ে এনে জল থেকে হাত বাড়িয়ে দেখাতে লাগল। কুচকুচে কালো রঙের ছেলে, ঝকঝকে সাদা দাঁতে হাসি ফুটিয়ে তুলল। বিজয়ের হাসি। তখন জাহাজ থেকে শুরু হল পয়সা ছোঁড়া আর ওদের কুড়িয়ে নেবার পালা। ছেলেগুলোর এই হচ্ছে পেশা এই করে পয়সা কামায়, পেট চালায়।

অপলা মুখার্জী বোধহয় ভেবেছিলেন ছোট ছোট কয়েন ওরা কিছুতেই কুড়িয়ে নিতে পারবে না। পেছনের দিকে সরে গিয়ে টলটলে স্থির জলে একটা দু'পয়সার কয়েন তিনি ছুঁড়ে দিলেন। সবাইকে আগেই বলা হয়েছিল অপেক্ষা করতে। এবার সংকেত পেয়ে সাত আট ফুট গভীর জল থেকে পয়সাটি কুড়িয়ে আনল আর একটি ছেলে। আমরা বেশ দেখতে পাচ্ছিলাম, পয়সাটি জলের গভীরে চলে যাচ্ছিল।

জাহাজ জেটিতে বাঁধা হলে বিকেলের দিকে অপলা দেবীরা চলে গেলেন মেরিনা বীচ দেখতে। মেইন গেট দিয়ে বেরোলে আধ কিমি দূরে জি-পি-ও, তারপর একটু দূরেই নেতাজী সুভাষ রোড, হাইকোর্ট বাঁ-হাতে সোজা এগিয়ে গেলে মেরিনা বীচ। এটা এক নামকরা সমুদ্রতীর। সমতল। ঘি-রঙের মিহি বালুতে নিপাট করা। বালুর উপর হেঁটে চল, পা দেবে যাবে, অথচ ব্যথা লাগবে না। কাছেই

সমুদ্রের হালকা ঢেউ এসে জলের কাছে বালুর উপর ভেঙে পড়ছে, ঝীজ ঝীজ শব্দ হচ্ছে, তারপর জলের তোড় আর নেই—কে যেন পেছু-ধাক্কায় হটিয়ে দিয়েছে ঢেউটাকে। এই ঢেউ-ভাঙা জলে-ভেজা বালুতীর থেকে ওঙ্গা আমাদের জন্য কিছু সম্পৎ কুড়িয়ে এনেছিল—শামুক, গুগলী এমনকি ছোট সাইজের শঙ্খও।

কাছেই একটি বিখ্যাত জিনিস অপলা মুখার্জীরা দেখে এসেছেন—পুরানো দিনের আইস হাউস। তখন তো আর ফ্রিজ ছিল না—বরফ তৈরী করে এনে এইখানে জমা করে রাখা হত। বিরানব্বুই বছর আগে ১৮৯৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার চিকাগো শহরে বক্তৃতা করেন। বিশ্বধর্ম সম্মেলনে। হিন্দু ধর্ম নিয়ে। পণ্ডিতের মতে তাঁর বক্তৃতাটিই শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছিল। সারা পৃথিবীতে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। আমেরিকা থেকে দেশে ফিরতে প্রথমে তিনি আসেন কলম্বোতে; সেখান থেকে মাদ্রাজে। মাদ্রাজে এসে তিনি এই আইস হাউসে বাস করেছিলেন। মাদ্রাজের লোক এখন আইস হাউসের নাম রেখেছে বিবেকানন্দ হাউস।'

ভাল করে মাদ্রাজ দেখতে না পেরে অনেকেই অখুশি, বিশেষ করে যারা নতুন এসেছে। সন্ধ্যা রাতেই জাহাজ ছেড়ে দিয়েছিল। কারণ মাদ্রাজে মাল ছিল খুব কম। কাজ শেষ হয়ে গেলে তো আর জাহাজ বেকার দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, কারণ রাজহংসর প্রতি মিনিটে খরচ পড়ে পঞ্চাশ টাকার মতো।

মাদ্রাজ ছাড়ার পর জাহাজ চলছিল ১৬২° ডিগ্রীতে। অটো-মেটিক কায়দায়। অর্থাৎ হাতে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে জাহাজের মাথা কম্পাসের ১৬২° ডিগ্রীতে রাখতে হয় নি। কম্পাসে রয়েছে মোট ৩৬০° ডিগ্রী। তার কাঁটা সব সময় ০° ডিগ্রী বা উত্তর দিকে। ০° ডিগ্রী থেকে ডাইনে ৯০° ডিগ্রীতে এলে পূব, ১৮০° ডিগ্রীতে দক্ষিণ, ২৭০° ডিগ্রীতে পশ্চিম দিক। রাজহংস দক্ষিণ পূবের আরও দক্ষিণ ঘেঁষে এগিয়ে চলেছিল। তখন পণ্ডিচেরী ছিল আমাদের চল্লিশ মাইল পশ্চিমে।

সাগর থেকে বিঘে খানেক ওপর আকাশে চাঁদ—দেখতে যেন কেমন ঘোলা ঘোলা। ক্ষয়-পাওয়া। বেলে-বেলে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে ছিল সারা আকাশে। মধুর করে হাওয়া বইছিল। রাজহংস ছুটে চলেছিল পনেরো মাইল বেগে। হাওয়া খেয়ে মনটা কবিত্ব করে বলল—এমন হাওয়া সব সময় পেলে খাওয়ার কথা ভোলা যায়। কিন্তু আসলে তা যায় না—টাইম টাইম ঠিক খেতে হয়।

ওঙ্গাকে রাতের আকাশের তারা চিনিয়ে দিচ্ছিলাম। মাস্তুলের ঠিক উপরে ছিল বৃহস্পতি। তার বিঘে দুয়েক নিচে মঙ্গলগ্রহ। বৃহস্পতির কাছ ঘেঁষে একটা চলন্ত আলো দেখে ওঙ্গা চেঁচিয়ে বলল—ঐ দ্যাখো। ঐ ··আসলে ব্যাপারটি অদ্ভূত কিছু নয়—একটা জেট প্লেন উড়ে যাচ্ছিল। আমরাও এগিয়ে চলেছিলাম; আর মনে হচ্ছিল, সমুদ্র যেন পেছনে ছুটে পালাচ্ছে।

এবার জাহাজ কিছু ধীরে চলছে। ফটফটে পরিষ্কার দিন। হাওয়ায় আর জলের স্রোতে আজ জোর খুব বেশি। এবং তা আবার আমাদের উল্টোদিকে বইছে। সুতরাং রাজহংসর চলন-বেগ কমে এখন ঘণ্টায় তেরো মাইলে ঠেকেছে। শ্রীলঙ্কার ত্রিঙ্কোমালী ছিল আমাদের একশ মাইল ডাইনে। রাবণ রাজার বাড়ি ত্রিঙ্কোমালী থেকে বেশি দূরে ছিল না; অশোকবন ছিল কাছে। সীতা অশোকবনে বন্দিনী ছিলেন। চলতি জাহাজে আমাদের এই সব রামায়ণী কথা মনে এলো।

তিন ভাগ লঙ্কা দ্বীপ ঘুরে আমাদের আবার সাগরে পড়তে হবে—সেখান থেকে এডেন বন্দর ডাইনে রেখে লোহিত সাগর। লোহিত সাগর তীরেই আরবের জেড্ডা বন্দর। আমরা এবার সেইখানেই যাবো। দুঃখের বিষয় এঞ্জিন ঘরে কিছু গোলযোগ দেখা দিয়েছে—ফুয়েল পাম্প ঠিকমতো কাজ করছে না। অলক্ষুণে কথাই বটে। ফুয়েল পাম্প না চললে জেনারেটর সিলিণ্ডারে তেল যাবে কি করে। কি করে বিজলী তৈরী হবে; কি করেই বা জাহাজ চলবে? ওঙ্গা তার আপন জগত থেকে একটা জুতসই 'জবাব' খুঁজে বের করেছে।

ওঙ্গা বেশ খুশির সঙ্গে বলছে– জাহাজ না চললে বেশ মজা হবে, সমুদ্রে ছিপ ফেলে বড় বড় মাছ ধরা যাবে। দুঃখের বিষয় ওর বাবা ওর সঙ্গে একমত নয়; অন্য এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিনি ফুয়েল পাম্প ঠিক করতে লেগে গেছেন।

পরের দিনের কথা। রাত সাতটা বাজে। আঁধার ঘনাবার আগে জলের রং ছিল নীল; এখন কালো ছাড়া কিছুই মনে হচ্ছে না। সামনেই ডণ্ড্রা হেড্‌স্ লাইট হাউস, পাঁচ মাইল দূরে শ্রীলঙ্কার তীরভূমি। লাইট হাউসের আলো হলদে রঙের; তিরিশ সেকেণ্ড পর পর জ্বলছে। এক সঙ্গে দুবার। আজ মঙ্গলগ্রহ রয়েছে মাস্তুলের ঠিক উপরে; বৃহস্পতি তার পেছনে দাঁড়িয়ে যেন মশাল জ্বেলে পাহারা দিচ্ছে। জেড্ডা এখনও ২৮৭৫ মাইল দূরে।

আপাতত চিফ কুক ডিম্যালো ডিসিলভাকে নিয়ে জাহাজে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে; কারণ সে রান্নায় বড় গোলমাল করে ফেলছে, বিশেষ করে পুড়িং তৈরী করতে। কেরাম্যাল কাস্টার্ড, ব্রেড-বাটার পুডিং, স্টিম পুড়িং বলে যা সে তৈরী করে তা প্রায় মুখে তোলা যায় না। এতে অসুবিধা হয়েছে সবচেয়ে বেশি ওঙ্গার। কারণ পুডিং ছাড়া বিশেষ কিছু আজকাল সে খেতেই চায় না। জাহাজের মেস-কমিটি থেকে চিফ কুককে ডাকানো হল; সব শুনে সে প্রথমে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তারপর ওঙ্গা পুডিং ছাড়া কিছু খায় না শুনে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

॥ ৯ ॥

এবার রাজহংস চলছে আরব সাগরে। উড়াল মাছ জল থেকে উঠে ফুরুৎ করে খানিক উড়ে গিয়ে আবার জলের মধ্যে ডুব দিচ্ছে। কিন্তু এসব মজা দেখার উপায় কারও ছিল না, কারণ সমুদ্র ভীষণ উতাল পাতাল করছে. হাওয়ার জোর খুব বেড়ে গেছে—রাজহংস দারুণ ছুলছে।

কাল রাতে আমার নিজেরই ভাল ঘুম হয় নি, বোধ হয় তেমন কারোই নয়। প্রায় জেগে-ঘুমিয়ে সবার রাত কেটেছে। সে এক আশ্চর্য অবস্থা—না-জাগা না-ঘুমানো আধা-চেতন ভাব; ছুনিয়ার কোপ কিছুই তখন ঠিকমতো ঠাহর করা যায় না। সারারাত মনে হয়েছে কে যেন আগা-পাছা ছুই হাতে তুলে ধরে জাহাজটাকে আছড়ে মারছে, আর জাহাজটা যেন বাচ্চা ছেলের মতো কেঁদে কেটে বলছে—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আর ছুষ্টুমি করব না।

সাড়ে দশ হাজার ঘোড়ার জোর নিয়ে রাজহংস চলছে, প্রতি মিনিটে প্রপেলার ঘুরছে একশ পনেরো বার; তার অর্থ, ঘণ্টায় অন্তত পনেরো মাইল বেগে জাহাজ চলা উচিত। জাহাজে বসে মাইল বলতে নটিক্যাল বা সামুদ্রিক মাইল অর্থাৎ ২০২৬'৬৬ গজ। জমির উপর চলে যাও। কলকাতায় কিংবা পাড়াগাঁয়ে বসবাস কর—সেখানে ১৭৬০ গজে এক মাইল। সাগরে সমুদ্রে ব্যাপারই আলাদা। ডাঙ্গায় মাইল থেকে এখন কিলোমিটার চালু হলেও সমুদ্রে ওসব চলবে না—সমুদ্রে নটিক্যাল মাইল; কিমি.তো দূরস্থান, ডাঙ্গার মাইল পর্যন্ত সমুদ্রে অচল।

সমুদ্রের অবস্থা খারাপ হতেই জাহাজের বেগ গেছে কমে; এখন ঘণ্টায় চলছে মোটে দশ মাইল। মনে হচ্ছে জেড্ডা পৌঁছাতে ছুইদিন দেরি হয়ে যাবে। আর তাই হলে জাহাজ কোম্পানীর বাড়তি

দেড়লাখ টাকা খরচ হয়ে যাবে, কারণ রাজহংসর দৈনিক খরচ প্রায় পঁচাত্তর হাজার টাকা—লোকজনের মাইনে, খাওয়া খরচা, তেল, জল, যন্ত্রপাতি, ডক ভাড়া, পাইলট খরচ, মেরামত খরচা ইত্যাদি সব মিলিয়ে গড় খরচ।

সময় এখন এগারোটা। জাহাজের সময়। জাহাজের বদলে এইখানে যদি একটা দেশ থাকত, তা হলে সবার ঘড়িতে এগারোটাই বাজত। ভারতে এখন বেলা বারোটা বেজে গিয়েছে। কারণ ভারতবর্ষ রয়েছে আমাদের পূবে—আমরা চলেছি পশ্চিম দিকে। যে দেশ যত পূবে, সে দেশে তত আগে সূর্য ওঠে। সুতরাং এখানে এসে তো ঘড়িতে ভারতের সময় রাখলে চলবে না। পূব থেকে পশ্চিমের দেশে এগিয়ে গেলে এজন্য ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে সময় কমিয়ে দিতে হয়। আমরা প্রায়ই প্রতিদিনে আধঘণ্টা করে কমিয়ে দিচ্ছি। পশ্চিম থেকে পূবে গেলে এর উল্টোটা, রোজ সেখানে আধঘণ্টা করে বাড়াতে হয়। পূব বা পশ্চিমে না গিয়ে জাহাজ উত্তরে বা দক্ষিণে গেলে সময় বাড়ে কমে না।

ভারতের পূবে পশ্চিমে দু'হাজার মাইলের দূরত্ব। কিন্তু সময় বাড়ে কমে না—সারা ভারতে একই সময় চলছে। একে বলে স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম। ফলে সকাল ছটায় কলকাতায় ফরসা হয়ে সূর্য উঠে। বোম্বেতে তখন ছটা বাজলেও অন্ধকার থাকে।

আরব সাগরে পড়তেই জল যেন কেমন মনে হয়েছিল—তিনভাগ সবুজের সঙ্গে যেন একভাগ লোহা রং মিশে আছে। আরও একটু এগিয়ে গেলে সেই রঙও আর রইল না—সাগর-জুড়ে তখন কালচে রং; জলের গভীরতা আড়াইশ' ফুট। একই সাগর হলেও জায়গায় জায়গায় রং বদলায়। সব সাগরেই।

এবার আমরা একটি আশ্চর্য দ্বীপের কাছে এসে পড়েছি, নাম তার মিনিকয়। খুবই ছোট্ট দ্বীপ—লম্বায় ছ মাইল, পাশে দু মাইল। সমতল এবং সবুজ গাছপালায় ভরা। লোক সংখ্যা মোটে ছ হাজার। ভারতের সর্ব দক্ষিণে কন্যাকুমারী। সেখান থেকে মিনিকয় সাড়ে

চারশ মাইল। মনে হচ্ছিল, কে যেন রশি ধরে একটানা মাটি ফেলে মিনিকয়ের সরল সোজা তীরটি গড়ে তুলেছে।

মিনিকয়ের পর সমুদ্রের অবস্থা ক্রমে খারাপ হয়ে চলল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকের শরীরের অবস্থাও ভাল রইল না। আজ দুদিন হল কারপেণ্টার মনিরাম সোলাঙ্কির জ্বর চলছে। সবাই গিয়ে দেখে আসছে, খোঁজ খবর নিচ্ছে। এরই মধ্যে ওঙ্গা কিছু চিন্তায় পড়ে গেছে—জাহাজ সমুদ্রে রয়েছে, ডাক্তার আসবে কি করে। সেকেণ্ড অফিসার প্রদীপ খান্না সোলাঙ্কিকে দেখতে এলে আমি বললাম—এই তো ডাক্তার।

জবাব দিলেন ওঙ্গার মা—'ধ্যেৎ, ওতো সেকেণ্ড অফিসার।'

'সেকেণ্ড অফিসারই জাহাজে ডাক্তারী করে। পৃথিবীর সব জাহাজেই' আমি বললাম—'এবং এজন্য ডাক্তারী পাশ করে আসতে হয় না।'

অপলা মুখার্জী বোধ হয় একটু রেগে গিয়েই বললেন—'ধুর্, ডাক্তারী পাশ না করে কেউ ডাক্তারী করতে পারে?'

'জাহাজে পারে', আমি বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করি—'জাহাজে মেডিকেল গাইড রয়েছে, অনেক ওষুধও রয়েছে—আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারেই। রোগের লক্ষণ মিলিয়ে গাইড দেখে ওষুধ দিলে উপকার হয় বৈকি।'

'যদি ইন্‌জেকশন দিতে হয়?'

'তার ব্যবস্থাও রয়েছে—'

'কিন্তু অবস্থা যদি খুব জটিল হয়ে পড়ে?'—

'বেতারে আমরা পরামর্শ নেই কোন মেডিকেল সেণ্টার থেকে। কিংবা যাত্রীবাহী কোন জাহাজ থেকে—যাত্রীবাহী জাহাজে ডাক্তার না থেকেই যায় না।'

'কিছুতেই কোন কাজ না হলে নিকটবর্তী কোন বন্দরে জাহাজ ভেড়াও, রোগী হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও। সোজা হিসাব।'

সমুদ্রে এখন ঠিক ঝড় বইছে না, তবে হাওয়ায় বেশ জোর আছে। তাতেই প্রায় লণ্ডভণ্ড অবস্থা। হাজার হাজার দৈত্যদানব মিলে যেন

সমুদ্রের জলে লড়াই শুরু করেছে। সারা সাগর তোলপাড়। আমার ডিউটি আটটায় শুরু, কিন্তু ঘুম ভেঙেছে ভোর পাঁচটায়। ক্যাবিনে মচ-মচ, মড়-মড়-মড়াৎ করে শব্দ হচ্ছে, যেন মাথার উপর এখনই ছাদ ভেঙে পড়বে। ক্যাবিনের অবস্থা খুবই শোচনীয়—চেয়ারগুলো উল্টে পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। টেবিলের ড্রয়ার আপনা থেকে খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে—ঠাস-ঠকাস শব্দ হচ্ছে। এ যেন মস্ত এক ভূতুড়ে কারবার —আমি শুয়ে শুয়ে সব দেখছি—না আছে ওঠবার ক্ষমতা। না কিছু করার। লাইফ জ্যাকেট, চায়ের কাপ, বইপত্র গড়াগড়ি যাচ্ছে; ফ্লাস্কের জল গড়িয়ে সব একাকার। ভাবলাম, বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নিলে কিছু ভাল লাগবে। ক্যাবিনের সঙ্গেই বাথরুম, অথচ দরজা খোলা গেল না—কোত্থেকে কি এসে যেন দরজা জাম করে ফেলেছে।

কিছু দৈত্যদানব যেন মধ্য জাহাজে মুগুরপেটা করছিল; এবার মনে হল, ওরা যেন সরে এসে রাজহংসর পেছনে হাজার চাবুকের ঘা মারছে—সারাটা জাহাজ থরথর করে কাঁপছে। ওদিকে সামনে থেকে আর পেছন থেকে ঢেউগুলো এসে জাহাজের মাঝখানে ভেঙে পড়ছে। মনে হচ্ছে জাহাজ বুঝি আর সইতে পারবে না; এবার চৌচির হয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে তলিয়ে যাবে! ঢেউগুলো কি আর কম? যাকে বলে পাহাড়ের মতো উঁচু কুড়ি-পঁচিশ ফুটের ঢেউ জাহাজের উপর দিয়ে গড়িয়ে ওপাশে গিয়ে ভেঙে পড়ছে। ভাগ্যিস ওয়াটার টাইট দরজা-গুলো বন্ধ; ক্যাবিনে জল ঢুকতে পারছে না।

জাহাজে অনেক ভাঙচুর হয়ে গেছে। সবার শরীর আর মনে অস্বস্তির অন্ত নেই। রান্না-খাওয়ার পাট আজ উঠে যাবার মতো। চিফ স্টুয়ার্ড লোক ভাল বলে ব্রেকফাস্টে সেদ্ধ ডিম আর রুটি মাখনের ব্যবস্থা করেছিল। এর বেশি কি করে বা করবে? গ্যালীর অবস্থা কি আর ভাল? সিন্দুকের মতো বড় একটি চুলো—লোহায় তৈরী। বিজলীতে চলে। এক সঙ্গে ছ'টা হাঁড়ি বসিয়ে রান্না করা যায়—ডাল, ভাত, মাংস ইত্যাদি। লোহার পাতে ঘিরে দিয়েও আজ হাঁড়ি বসিয়ে রাখার উপায় আছে, নাকি কুকগুলোই খুব সুস্থ আছে?

দোলনের সাগরে ওঙ্গার অবস্থা? খুব খারাপ নয়। এই বুঝি জাহাজ কাত হয়ে গেল! এই বুঝি বমি করে ফেললাম জাতীয় দুর্ভাবনা ওর মাথায় খেলে না, সুতরাং সাগর পীড়ায় ওকে ভুগতে হয় না। বমি করাটা আসলে মনের রোগই বলতে হবে। মাত্র ছ মাসের শিশুকে নিয়ে দোলনের জাহাজে চলুন। উতাল পাতাল সাগরে সে নির্বিকার—সে বুঝতেই পারে না সাগরে আছে, নাকি আকাশে।

ওঙ্গা এতদিন কিছু স্বার্থপরের মতোই চলেছে—জাহাজে এসে জাহাজ নিয়ে মেতেছে। সাগরে এসে সাগর নিয়ে পড়েছে। বিড়াল ছানাটার উপর নজর দেবার সময় আর ওর হয় নি। তার কথা তেমন মনেও বোধ হয় পড়ে নি। কে জানে দোদুল সাগরের জন্যই কিনা বাচ্চাটাকে আজ আর ও তেমন কাছ-ছাড়া করে নি। হয়তো ভেবেছে, বাচ্চাটার একটু যত্ন নেওয়া দরকার। বিকেলের দিকে ওঙ্গার সঙ্গে বিড়াল ছানাটাও আমার ক্যাবিনে এসে হাজির। আমি বললাম হাই, মিনি।

মিনি বলল—মিউ!

॥ ১০ ॥

বিড়াল-কোলে ওঙ্গা যেদিন রাজহংস জাহাজে এসে উঠেছিল, আমি বলেছিলাম—তা হলে মিনিও তোমার সঙ্গে বিলেতে যাবে?

'মিনি নয়' সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে ওঙ্গা বলেছিল—'ওর নাম বিলু।' বিলু যেন বেড়াল ছানা নয়, মানুষের বাচ্চা, আর আমি যেন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে কথা বলি নি; ওঙ্গা তাই হয়তো আমাকে বুঝিয়ে দিল।

জাহাজে এসে বিলুও এখন বেশ চালাক হয়ে গেছে। কি করে যেন বিলু টের পেয়েছে জাহাজে অনেক ইঁদুর আছে। ওর বেশ ভাল ভোজ হবে। ক্যাবিনে ক্যাবিনে নির্ভাবনায় গিয়ে বিলু এখন ইঁদুর

খোঁজে। আমার ক্যাবিনে থাকে মতি। সেয়ানা এলসেশিয়ান কুকুর। কিন্তু বিলুর ভ্রূক্ষেপ নেই—বোধ হয় প্রথম থেকেই বিলু ভেবে নিয়েছে, ওর ছোট্ট মনিবটির চাইতে জাহাজে কেউই বড় নয়।

মতিটা কিন্তু একটু নির্জীব হয়েই পড়েছে। মাতাল মানুষের মতো মাথা তুলতে পারছি না। বিলুর মতো বাচ্চাকালেই মতিকে জাহাজে নিয়ে এসেছিল তখনকার থার্ড অফিসার রতন সরকার। তা বছর পাঁচেক আগে। শুধু রতনই নয়। পাঁচবছর আগেকার কোন লোকই এখন জাহাজে নেই; আছে শুধু মতি নামে কুকুরটি। নতুন থার্ড অফিসার এলেই মতির ইতিহাস শোনে, তার সঙ্গে বন্ধুতা করে—মতিও থার্ড অফিসারের ক্যাবিনের দখল ছাড়ে না। যদিও সারা জাহাজে যখন যেখানে খুশি পড়ে থাকে। বন্দর ছেড়ে রাজহংস সমুদ্রে বের হলেই মতি সকাল বিকাল আটটা-বারোটায় থার্ড অফিসারের সঙ্গে ব্রিজে গিয়ে ডিউটি করে—রতন সরকারের সঙ্গেও তাই করত।

বিলু যেদিন প্রথম জাহাজে এলো মতি কিছু অসহিষ্ণু হবার লক্ষণ দেখিয়েছিল, বিস্তর বিরক্তি প্রকাশ করেছিল। আমি ধমক দিয়ে বলেছিলাম—বিলু ফ্রেণ্ড! সেই থেকে মতি মোটামুটি বিলুকে মেনে নিয়েছে।

সমুদ্রের অবস্থা আপাতত একটু শান্ত, যদিও তা নিয়ে মনে কারও কোন সান্ত্বনা নেই, কারও কোন ভরসাও নেই। অশান্ত সাগরে অনেকের অনেক রকম অবস্থার কথাই কানে আসতে শুরু করেছে, আমরাও যথাসাধ্য এ ওর খোঁজ নিচ্ছি—কারণ আমরা জাহাজী। একই জাহাজের। এক বাড়ির অনেক লোকের মতো।

আব্দুল মান্নান এঞ্জিনের ফায়ারম্যান। এটা তার প্রথম সফর। চার নম্বর ফলকার উপর নির্জীব হয়ে সে পড়ে ছিল। একে দোলনের সাগর, তার উপর এঞ্জিন ঘরের গরম, তেল-মবিলের গন্ধ—বেচারা বমি করে করে একসা। দোলনের সাগরে পেটে দানাপানি পড়ে নি —শেষ পর্যন্ত পিত্তবমি, এবং বমি করতে গিয়ে গলা চিরে রক্তপাত। 'মুই খিদিরপুরে দিলের খোসে ঘুরে বেড়াচ্ছিনু। আব্বা মোকে ধরে

দরিয়ায় পেঠিয়ে দিলে।' কথাগুলো মান্নানের—ফলকায় পড়ে অবচেতনে মাঝে মাঝেই সে উচ্চারণ করেছে।

জামাল তখন কষে মান্নানকে দে ধমক—'আরে উঠে আয় বে। ভাতে নেবু চটকে ঝাল গোসের সুরুয়া দিয়ে খেয়ে লিগে যা। দরিয়ার বেমারি পেলিয়ে যাবে।'

জামাল অনেকদিনের পুরানো জাহাজী, ফায়ারম্যান থেকে এখন তেলওয়ালা হয়েছে অর্থাৎ এঞ্জিন ঘরে গ্রীজার। জাহাজে যারা নতুন আসে, সুযোগ পেলেই দোদুল সাগরে এখনও নাকি সে নিজে লুকিয়ে লুকিয়ে বমি করে। এঞ্জিন ঘর থেকে কেবলই পালিয়ে বেড়াবার ফাঁক খোঁজে।

ফিফ্‌থ্ এঞ্জিনীয়ার পরমেন্দর সিং অরোরাও নতুম ছেলে। তার অবস্থাও তেমন ভাল যায় নি। অরোরা সেকেণ্ড ইঞ্জিনীয়ার ইব্রাহিম জাফরের সঙ্গে সকাল-বিকাল চারটে-আটটা ডিউটি করে। দুজনেই তারাতলা ডি-এম-ই-টি থেকে ট্রেনিং নেওয়া। কিন্তু ডিউটির বেলায় খাতির নেই। প্রথম দিনই সেকেণ্ড সাব পাঁচ-সাবকে বলে রেখেছিল, 'বমি হোক, মাথা ঘুরুক, তোমার কাজ তোমাকে করতেই হবে।' কিন্তু অরোরার সে কথা আর মনে ছিল না; দোলনের জাহাজে কেমন যেন অসাড় হয়ে পড়েছিল। একটা উৎকট মোহনিদ্রার অবচেতনে কেবলই সে ভেবেছে, সে যেন মরে গেছে। তার মৃতদেহ, ঘড়ি, কলম, লিখবার প্যাড টেবিলের উপর পড়ে আছে। স্বপ্নের ঘোরে অরোরা যেন দেখছিল, তার আত্মাটা দেহের বাইরে ঘুর ঘুর করছে কিছুতেই দেহের মধ্যে আর প্রবেশ করতে পারছে না! যমদূত ডাণ্ডা হাতে মৃতদেহের কাছে দাঁড়িয়ে গোঁফে তা' দিচ্ছে। কি বিচ্ছিরি স্বপ্ন!

ঠিক তখন পাঁচ-সাব যেন একটি বিকট আওয়াজ শুনতে পেল —খটাস্! চমকে উঠে পাঁচসাব চোখ মেলে দেখতে পেল, সে আপন ক্যাবিনে শুয়ে আছে, পাশে দাঁড়িয়ে আছেন বড়া সাব আর ক্যাপটেন। ঠিক তখন তার আপন স্টুয়ার্ড ডুলসিভিনো পিণ্টো এক গেলাস বরফ

দেওয়া লেবুর রস মুখের কাছে এনে বলল—পী লো সাব, আভি আচ্ছা হো জায়গা।'

পাঁচসাব বলল—'জাহাজ এখন কোথায় ?'

আমি বললাম—'কচিন থেকে ১১১° মাইল পশ্চিমে। সকোত্রা দ্বীপ থেকে ১৬৫ মাইল পূবে।' পাঁচসাব চোখ মিটমিট করতে লাগল।

বিকেল পাঁচটা বাজে। এঞ্জিন ঘরে দারুণ ব্যাপার ঘটে গেছে—এক নম্বর ইউনিটের ফুয়েল পাম্পের ইনটেক পাইপ ফেটে গেছে; তেলের তাপমাত্রা ১১০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, সুতরাং কাছে গিয়ে বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব নয় বলে আটটা ইউনিটই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জাহাজ নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। সারা আরব সাগর জুড়ে ঢেউ খেললেও রাজহংস আর তত দুলছে না। ঢেউর পর ঢেউ ভাঙা সাদা ফেনাগুলো দেখে মনে হচ্ছে যেন সাগরময় সাদা সাদা লক্ষ কোটি ফুল ফুটে আছে।

এঞ্জিন বন্ধ হতেই ক্যাপটেন নিঃশব্দে গিয়ে ব্রিজে দাঁড়িয়েছেন। তখন ব্রিজ ডিউটিতে ছিলেন চিফ অফিসার মিণ্টু মৈত্র। ক্যাপটেনকে দেখে মিণ্টু মৈত্র বললেন—'গুড ইভিনিং স্যার।' তার সেলাম নিয়ে ক্যাপটেন পাটনায়ক সজাগ দৃষ্টিতে চারদিক একবার দেখে নিলেন। রেডার তখনও চলছে দেখে তাঁর ভাল লাগল। রেডার চালু থাকলে আর ভয় কি—আমাদের চারদিকে অন্য কোন জাহাজ আছে কিনা, সাগরের তলে কোন পাহাড় পর্বত আছে কিনা তার সব ছবি তো রেডারে পাওয়া যাবেই! কোন্‌টা কত দূরে ছবি দেখে মেপে নিলেই হল।

'মেট,' রেডারের দিকে তাকিয়ে ক্যাপটেন বললেন—'আমাদের আশেপাশে অন্য কোন জাহাজ রয়েছে কি ?'

'নো স্যার', চিফ অফিসার বললেন—'একটার সময় যে জাহাজটা আমাদের স্টারবোর্ড বিমে ছিল, এখন সেটা অনেক দূরে। পোর্ট সাইডে।'

'আর সেই ভূতুড়ে জাহাজটা ?'

'এখনও দশ মাইল দূরে রয়েছে স্যার।'

ক্যাপটেন পাটনায়কের ভ্রু কুঁচকে গেল। কারণ আছে। গত তিন দিনে একটা জাহাজকে পোর্ট কোয়ার্টারে একই দূরত্বে চলতে দেখা যাচ্ছে—এগোয় না, পিছোয় না। রেডিও অফিসার গণেশ নারবেকার রেডিও টেলিফোন এবং ভি-এইচ-এফ্ দিয়ে যোগাযোগ করার অনেক চেষ্টা করেছেন, সাড়া পান নি। সবাই এখন খুব অবাক হয়ে ভাবতে শুরু করেছে, ওটা কি চলন্ত জাহাজ, নাকি কোন মৃত জাহাজের কঙ্কাল, ভূতে চালিয়ে চলেছে!

ক্যাপটেন স্টারবোর্ড উইংস থেকে লক্ষ্য করে দেখলেন, ক্রিস্‌মাস ট্রিতে ছুটো কালো বল ঝুলিয়ে দিতে ডিউটি অফিসার ভুল করে নি—দূর থেকে দেখলেই অন্য জাহাজ বুঝতে পারবে রাজহংস এখানে বিকল হয়ে পড়ে আছে। ক্যাপটেনের কাছেই বাইনোকুলার হাতে কাডেট রঞ্জন শর্মা দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ ক্যাপটেনের দৃষ্টি পড়ল ক্যাডেট শর্মার খালি বোতাম ঘরে। তীব্র দৃষ্টি। কিছুই বলতে হল না—ক্যাডেট বোতাম লাগিয়ে নিয়ে লজ্জিত মুখে বলল—'সরি স্যার।'

'মেট', ক্যাপটেন আবার বললেন—'ঐ ভুতুড়ে জাহাজের খাঁচাটা রেডারে আর যখন ধরা পড়বে না, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ডেকে দেবে।'

'আই-আই স্যার', চিফ অফিসার বললেন—'আমি সব সময় রেডার চালিয়ে রাখব স্যার।'

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বেজে গিয়েছে। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। মাক্কি আইল্যাণ্ডের উপরে লোহার দণ্ডে কালো বলের জায়গায় এখন ছুটো লাল আলো জ্বলছে! রাতের বেলায় বিকল জাহাজের এই হচ্ছে লক্ষণ। অন্য জাহাজ এই আলো দেখলে সাবধান হবে, দূর দিয়ে চলে যাবে, যাতে আমাদের ঘাড়ের উপর এসে পড়তে না হয়।

রাত নটা নাগাদ চিফ এঞ্জিনীয়ার ব্রিজে ফোন করে জানিয়ে দিলেন, এঞ্জিন এবার চলার জন্য প্রস্তুত। ক্যাপটেনকে তিনি আগেই জানিয়েছিলেন। স্থতরাং ক্যাপটেন সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজে চলে এসেছেন। এডেন বন্দর এখন রাজহংস থেকে সাড়ে সাতশ মাইল দূরে। কেমন যেন একটা উৎকট আঁশটে গন্ধ চারদিক থেকে ছুটে আমাদের নাকে

আসছে। সে এক অসহ্য গন্ধ। অথচ এই মধ্য সমুদ্রের কোথাও কেউই এখন মাছ ধরছে না, ধারে কাছে মেছো হাটাও নেই। ক্যাপটেন আমাকে বললেন—'ব্যাপার কি বলতো থার্ড মেট ? আজ সারাটা দিনই যে ভুতুড়ে কারবার চলছে !' ঠিক তখন মাস্তুলের কাছে দাঁড় কাকের কণ্ঠে আওয়াজ হল—কা, কা, কা। অথচ কোন কাকপক্ষী সেখানে ছিল না ; তীব্র আলো ফেলে দেখাও গেল না।

হেল্‌ম্‌স্‌ম্যান চেঁচিয়ে বলল—'হুইল অন টু সিক্সটি স্যার।'

ক্যাপটেন বললেন—'স্টেডি !'

॥ ১১ ॥

এঞ্জিন খারাপ হয়ে পড়লে রাজরংস কিন্তু সমুদ্রের এক জায়গাতে দাঁড়িয়ে ছিল না ; একটু করে পেছু হটছিল। কারণ নোঙর করা হয় নি। ওখানে জল ছিল পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট গভীর, অথচ নোঙর করা যায় জল যেখানে দেড়-দু শ ফুটের বেশি গভীর নয়।—বিশেষ করে সমুদ্রের তীরের কাছে, কিংবা নদীতে। আমাদের নোঙরহীন জাহাজ একটু করে পিছু হটছিল; কারণ সামনে থেকে স্রোত বইছিল দু'মাইল বেগে। এঞ্জিন বন্ধ ছিল মোট চার ঘণ্টা বড়জোর আট মাইল আমরা পিছিয়ে গিয়েছি। জাহাজ চললে আধ ঘণ্টার ব্যাপার।

বাবেলমণ্ডব প্রণালী পার হয়ে আমরা এসেছি লোহিত সাগরে। লোহিত সাগর কিন্তু লাল নয়, জল সুন্দর ঘন নীল। ইতিহাস কিছু করুণ। অবশ্য পুরানো দিনের ইতিহাস। তখন জাহাজ চলত এঞ্জিন ঘরে কয়লা পুড়িয়ে সেখানে কাজ করতে গিয়ে সবাই গরমে ঝলসে যেতো। মাঝে মধ্যে ডেকের উপর উঠে এসে যে হাওয়া খেয়ে যাবে সে উপায় ছিল না, কারণ অল্প স্বল্প যেটুকু হাওয়া মিলত তা ছিল দারুণ গরম—খৈভাজা বালুতপ্ত হাওয়ার মতো। কেবিনে গিয়ে বসবারও উপায় ছিল না লোহার দেয়ালগুলো সেখানে গরমে

তেতে থাকত। তা হলে উপায়? না ছিল জবাব, না কোন উপায়। গরম সইতে না পেরে কেউ কেউ জলে দিত ঝাঁপ। ঠাণ্ডা হবার জন্য। কিংবা জীবনের জ্বালা চিরদিনের মতো জুড়িয়ে নেবার জন্য। আর উঠত না।

আশ্চর্য, লোহিত সাগরে এবার তেমন গরম ছিল না; ফুরফুর করে হাওয়া পর্যন্ত বইছিল। যুগ বদলে গেছে, হাওয়া পাল্টে গেছে। আমাদের জাহাজ এখন এয়ার কণ্ডিশান করা। তার উপর ক্যাবিনে ক্যাবিনে আবার ছুটো করে পাখা। জাহাজ তৈরীতেও এখন কত কারিগরি, ক্যাবিনে ক্যাবিনে লোহার বাল্ক হেডগুলো পাতলা কাঠে প্যানেল করা—এয়ার কণ্ডিশন না চললে আগের মতো গরম হতে পারেই না।

'বাল্ক হেড মানে?' অপলা মুখার্জী প্রশ্ন করেন।

'সোজা বাংলায়, ইংরেজীতে যাকে বলে ওয়াল'—আমি জবাব দেই।

'জাহাজীরা কি আলাদা ডিক্সনারী কিনে ইংরাজী শেখে নাকি?'

'কেন, একথা বলছেন কেন?'

'নয়তো কি? ফ্লোর (মেঝে) জাহাজে ডেক বনে যায়, বাম-ডান পোর্ট স্টার-বোর্ড হয়—

'জলও তো কারও মুখে ওয়াটার, কারও মুখে পানি—'অপলা দেবী হাসতে থাকেন।

লোহিত সাগরে ঢুকে আমরা অনেকদূর এগিয়েছি। ডাইনে আরবদেশের উপকূল রেখা। জেড্ডা এখনও আটাশ মাইল দূরে। আমরা এডেন পেছনে ফেলে এসেছি পরশুদিন। তখন ইয়েমেনের উপকূলে দেখা গিয়েছিল অনেক পাহাড়। গাছপালা হীন অলক্ষী চেহারা। ধূসর কালো রং। আমাদের বাঁয়ে ছিল তখন আফ্রিকা মহাদেশের রুক্ষ পাহাড়ী উপকূল—খুব অস্পষ্ট, দেখা যায় কি না যায়। লোহিত সাগরের আকাশ তখন খাঁ খাঁ করছিল।

চলতি পথের সাগর তীরে যদি গাছ-পালা না থাকে আকাশে যদি

মেঘ দেখা না যায়, দিগন্ত সন্ধ্যায় যদি রং বদল না ঘটে, সমুদ্র-যাত্রা ফিকে বোধ হয়, মনে হয় পথে পথে কি যেন হারিয়ে চলেছি—যেন আমাদের কত কি ছিল, এখন নেই। আরব সাগরে পড়তেই আমাদের আকাশের মেঘ উধাও, বৃষ্টির বালাই নেই—জলের রং পর্যন্ত বদলে গেছে। আরব সাগরের এক জায়গায় জল দেখে আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কি দুরন্ত নীল জল—একবালতি জলে আড়াইশ গ্রাম নীল গুলে রাখলে যেমন দেখায় তেমন রং। পাইপে টেনে নিয়ে এই জলে চান কর—নীল দেখাবে না; কাপড় ভিজিয়ে চিপে নাও—কাপড়ে নীল লাগবে না। কি বিচিত্র!

রেডারে গোটা দশেক জাহাজ ধরা পড়েছে পনেরো মাইলের মধ্যে। তিনটি তার রাজ কোম্পানীর জাহাজ—রাজ-তিলক, রাজগৌরব, রাজ-শক্তি। রাজ-শক্তির সঙ্গে আমাদের এইরকম কথা হচ্ছিল, ভি-এইচ-এফ এ ঃ

তোমরা কোথায় চলেছ?

জেড্ডায়।

তোমরা?

লণ্ডনে।

কলকাতায় ফুটবলের খবর কি?

মোহনবাগান জিতেছে। ইলিশ মাছ চল্লিশ টাকা বিক্রী হয়েছে—

হ্যাত, বাজে কথা!

আমরা জেড্ডায় পৌঁচেছিলাম বেলা দুটোয়। ডকের জলের রং দেখে তো অবাক—জলে সবুজের ভাগ খুব বেশি, নীলের ভাগ কম, সাদার ভাগ আরও কম; সব মিলে অদ্ভুৎ সুন্দর। এ যেন রূপকথার দেশে রূপসাগরের জল—জলে নেমে সাঁতার কাটো, জলকেলী কর, গায়ে জল ছিটিয়ে ভীত বন্ধুকে জলে টেনে আনো। এই জলের মাছ দেখতে না-জানি কত ভাল।

হঠাৎ চোখে পড়ল একটা নাবিক ছেলেকে, ডেকের 'পরে দাঁড়িয়ে

বড়শী ফেলে সে মাছ ধরছিল—লাল রঙের ছোট ছোট মাছ। এমন সুন্দর জলের মাছ অমন টকটকে লাল না হলে কি আর মানায়? কে জানে, এখানে হয়তো সবুজ মাছ, আর হলদে মাছও আছে। হঠাৎ নাবিক ছেলেটা বড়শী ফেলতে ফেলতে একটি আশ্চর্য কথা বলল আমরা দিব্যি শুনতে পেলাম, সে বলছে—'আমার নাম বেনে, মাছ ধরি টেনে। এ যে দিব্যি বাংলা কথা। এবার ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম ওর জাহাজে লেখা রয়েছে সুন্দর একটি নাম—বাংলার তরণী। পেছনে বাংলাদেশের পতাকা পত পত করে উড়ছে!

জেড্ডায় এসে মনে হল, কিই রমরমা বন্দর—চারদিকে শুধু জাহাজ আর জাহাজ ডকের বাইরেই তখন ছিয়াত্তর খানা জাহাজ নোঙর করে দাঁড়িয়ে আছে—জাহাজে জাহাজে জেড্ডা ছয়লাপ! চীন, জাপান, ভারত, বাংলাদেশ, ইংলণ্ড, আমেরিকা, ইটালী, গ্রীস, স্পেন, জার্মানী, পোল্যাণ্ড, রাশিয়া ইত্যাদি কত দেশের জাহাজ। সবাই সৌদি আরবের জন্য কোন-না-কোন মাল নিয়ে এসেছে—পোশাক-আশাক, যন্ত্রপাতি, মাছ-মাংস, দুধ-মাখন, তরিতর-কারি। চাল-ডাল, তেল-মশল্লা, রেডিও ক্যামেরা, ঘড়ি-টিভি-ভিসিআর—কি নয়। আর আমরাই কি কিছু কম এনেছি? চা, তামাক, যন্ত্রপাতি মিলে তিন হাজার টন।

মরুভূমির দেশ বলে আরবে প্রায় কিছুই হয় না। তবে মরু-ভূমির মাটির নিচে ওদের তেল আছে! অনেক তেল। লোকের হাতে তাই অনেক টাকা। তেল বেচা টাকা। সেই টাকা দিয়ে সারা পৃথিবী থেকে ওরা সব কিছুই কেনে। রোজকার জীবনে যা কিছু দরকার। তাই জেড্ডা বন্দরে এতো জাহাজ এসে ভিড় করে, ডকের মধ্যে কবে ঢুকবে তারদিন গোণে। আমাদের অবশ্য দিন গুণতে হয় নি—আমরা সোজা চলে এসেছিলাম ডকের মধ্যে। রাজহংসে জেড্ডার জন্য যে মাল ছিল হয়তো শহরে তার অভাব আছে। তাই তাড়াতাড়ি ভেতরে নেওয়া!

রাজহংস ডকে ভেড়াবার সময় ডানদিকের জেটিতে খুব ভীড়

দেখা যাচ্ছিল। কম করে হাজার দেড়েক লোকের ভীড়। সবাই হজ করতে এসে এইমাত্র নেমেছেন মিশরের জাহাজ থেকে। জেলহজ্জ মাসের ন' তারিখে হজ,। দিন সাতেক আর বাকি আছে। সারা পৃথিবীর তীর্থযাত্রী মুসলমান এসে রোজ এখন জেড্ডায় নামছেন। জেড্ডার পর মক্কা মদিনার পালা। মক্কা হজরত মহম্মদের জন্মস্থান, জেড্ডা থেকে মাত্র চল্লিশ মাইল— কলকাতার শ্যামবাজার থেকে যেন ব্যারাকপুর। সব সময়ে বাস চলছে।

প্যাসেঞ্জার জেটিতে আমাদের দেশের একটি জাহাজ বাঁধা রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। তার নাম আকবর!

॥ ১২ ॥

জেড্ডার জেটিতে জাহাজ ভিড়লে প্রথমদিন তো কেউ বাইরেই যেতে পারল না। কারণ বন্দর-কর্তাদের হুকুম ছিল না। এজেন্ট এসে আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা রেখে গেল। তিরিশ হাজার সৌদি রিয়াল। এজন্য অবশ্য আগেই বেতার-বার্তা রাজহংস থেকে পাঠানো হয়েছিল। বাইরে যেতে গেলে সবারই তো টাকা চাই। অফিসার ক্রু সবার। জাহাজ যখন যে দেশে যায় সেই দেশের টাকা সবাইকে দেওয়া হয়। অগ্রিম বেতন হিসাবে। যার যতটুকু পাওনা। হিসাব মতো যে যার পাওনা বুঝে নিয়ে বাইরে যাবার আশায় অপেক্ষা করছিল। শেষ পর্যন্ত হুকুম এসেছে বটে। মোটে দশজনের। যে কোন দশজন মাত্র বাইরে যেতে পারবে। হয়তো কালকে যাবে আরও দশজন। তারপর আবার পরশু। কিন্তু পরশু যদি রাজহংস জেড্ডায় না থাকে? কেউ বাইরে যাবে না—সোজা কথা! এজেন্টের লোক দিব্যি বলে গেল।

সবাই হতবাক। নাবিক হিসেবে গিয়ে পৃথিবীর আর কোথাও এমনটি কেউ শোনে নি, ছাখে নি। জাহাজ বন্দরে ভিড়লে যতজন খুশি বাইরে যাও। যেখানে খুশি পড়ে থাকো—শুধু জাহাজ ছাড়ার

দিন হাজির হলেই হল। রাশিয়ার অবশ্য একটু আলাদা নিয়ম—যখন খুশি বাইরে যাও। রাত বারোটার মধ্যে ফিরতে হবে। বন্দর এলাকার বাইরে যেতে পারবে না। তা যাওনা ওডেসার শেবশেঙ্কো পার্কে। দশজনে মিলে গলাগলি ধরে গিয়ে পার্কে বসে পড়। কৃষ্ণসাগরের ঢেউ গুনতে থাকো—কেউ কিছু বলবে না। ভারতে তো সকলের জন্য সব সময় দুয়ার খোলা। ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, জার্মানী ইত্যাদি প্রায় সব দেশেই। কিন্তু একি ব্যাপার আরবে?

বাইরে যাবার হুকুম হয়েছে তো দশজনের। কিন্তু কোন্ দশজন? বাছাই হবে কি করে? বাইরে যেতে তো সবাই তৈরী—কাকে ফেলে কাকে নেওয়া হবে? শেষ পর্যন্ত অবশ্য উপায় খুঁজে বের করতে হল—তিনজন অফিসার। সাতজন ক্রুর বাইরে যাওয়া সাব্যস্ত হল। ক্রু বাছাই করবে সব ক্রু মিলে; অফিসারদের তিনজন তারাই মিলে বেছে নেবে।

পৃথিবীর সবদেশেই শহরে যাবার পদ্ধতি মোটামুটি এক—ডকের গেট পেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াও, ট্যাক্সি নাও নয়তো ট্রামবাস ধর। নয়তো হেঁটে চল। কিন্তু জেড্ডায় নয়। এজেন্টের লোক এসে প্রথমে পাসপোর্ট মিলিয়ে দশজনকে আপন গাড়িতে তুলে নিল। তারপর গাড়ি থামল গিয়ে কাষ্টম্সের কাছে—সেখানে টাকা পয়সা এবং শরীর তল্লাসী হল। তারপর সবাইকে গেট পার হতে হল—পুলিশ গুণছে। আমরা হেঁটে বেরিয়ে যাচ্ছি। এবার আমাদের নিয়ে গাড়ি চলল জেড্ডা শহরে, রিয়াদ হোটেলের কাছে নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভার বলল—পাঁচটায় এখানে এসে আবার গাড়িতে উঠবে। আমরা বাইরে থাকার সময় পেলাম মাত্র তিনঘন্টা।

জেড্ডা শহর দেখতে মন্দ নয়; ঝকঝকে পরিষ্কার পথঘাট। নিত্য-নতুন তৈরী হয়েই চলেছে। পাঁচ সাত তলা দালানকোঠা উঠে শহর ছেয়ে ফেলেছে। কিন্তু গাছপালা কোথাও নেই বললেই চলে। অনেক যত্ন, অনেক কেয়ারী করে, অনেক জল ঢেলে সামান্য কিছু লাগানো হয়েছে বটে—বেশির ভাগ ছোট গাছ। গুল্ম জাতীয়। নয়তো

কেবল খেজুর গাছ। খেজুর গাছ গুলোও যেন তেমন সতেজ সরল নয়। মরুভূমির দেশ যে!

পায়ে হেঁটে আমরা খুব তো ঘুরছি। তেষ্ঠাও পেয়েছে। আর তখন আইসক্রিম্ দেখলে না কিনে পারা যায়! বড় বড় আইসক্রিম। বেশ শস্তা—একটা মাত্র পৌনে এক রিয়াল। আমাদের আড়াই টাকা আর কি। আরব দেশ খেজুরের জন্য বিখ্যাত। বড় বড় মিষ্টি খেজুর। পনেরো টাকা কিলো। কিন্তু জেড্ডার খেজুর গাছে খেজুর কোথায়? সব খেজুর নাকি ফলে মক্কা মদিনার দিকে। সবাই তাই তো বলল।

সব জিনিসের দামই সস্তা মনে হচ্ছে। আরবদের আয়ের অনু-পাতে। এক কিলো ভাল চাল ছটাকা। লাল টকটকে রসটুপটাপ অষ্ট্রেলিয়ান আপেল সাতটাকা কিলো। মাছ কুড়ি টাকা। মাংস তিরিশ টাকা। পিন থেকে পান সুপুরী। আপেল থেকে মোটর গাড়ি বিদেশী মাল। ঘড়ি, ক্যামেরা, ভি-সি-আর—সব বিদেশী।

রাস্তায় মোটর গাড়িগুলো ছাখো—সব বড় বড় গাড়ি। ক্যাড়ি-লাক। শেভ্রলে; নয়তো টয়োতা। সব বিদেশী মাল। গাড়িগুলো প্রায়ই এয়ার কণ্ডিশন করা। চাল ডাল, দুধ মাখন। তরিতরকারি ফলের মতো গাড়িগুলোও নাকি শস্তা। পৃথিবীর ব্যবসাদার লোকগুলো বড় সেয়ানা—রপ্তানীর মালগুলোর দাম খুব কম করে ধরে, যাতে বিদেশের লোক বেশি করে কেনে।

আরবে জিনিসপত্রের দাম কেন শস্তা বলছি? কারণ ওদেশের লোক মাসে ষাট সত্তর হাজার টাকা রোজগার করে। সৌদি আরব তেলের দেশ। তেল বেচে অনেক টাকা পেয়ে সৌদিরা জীবনের চাল-চুলোর, চেহারা এমন করে ফেলেছে—বেশি করে টাকা নাও, মাছ মাংস কেনো বাড়ি গাড়ি কেনো। আরামে খাও, থাকো। ষাট হাজার টাকা মাসে মাইনে পেয়ে ছটাকায় চাল। কুড়ি টাকায় মাছ। তিরিশ টাকায় মাংস শস্তা নয়তো কি! সৌদিরা ভাল খায়, ভাল থাকে।

আর প্রতি বছর বিদেশে পাড়ি জমায়। মিশরে, ইংলণ্ডে, আমেরিকায় কিংবা ভারতে।

জাহাজে কাজ করে আমরাও অবশ্য দেশ দেখছি। এযেন পড়তে পড়তে চাকুরি করা, কিংবা চাকুরি করতে করতে পড়া। ধরণই আলাদা!

বৈজ্ঞানিকরা হিসেব করে দেখেছেন, সারা পৃথিবীর মাটির নিচে যে পরিমাণ তেল এখনও আছে তাতে নাকি আর বছর চল্লিশেক চলবে। সৌদি আরব নাকি একটি কাজ করেছে—আগামী দু'শ বছরে তাদের যে পরিমাণ তেল দরকার হবে। সেই তেল রেখে বাকি তেল তুলে বিক্রী করে টাকা করছে। আরবের মরুভূমির নিচে আরও অনেক সম্পদ রয়েছে—সোনা আর ইউরেনিয়াম। তা বেচলেও টাকা হবে বৈকি!

আমার তো মক্কা দেখার খুবই সাধ ছিল। কিন্তু উপায় নেই। ধর্মের বাধা রয়েছে। হিন্দুর পক্ষে মক্কা যাবার হুকুম নেই!

আরব মরুভূমির দেশ; জলের বড় অভাব। কিন্তু মক্কায় একটি আশ্চর্য কূপ আছে। নাম তার জুম জুম। মক্কায় যেতে না পারলেও জুমজুমের গল্প জেড্ডায় বসে শুনতে ভালই লাগল। সত্যি গল্প—

হজরত মহম্মদ মক্কায় জন্ম নিয়েছিলেন একহাজার চারশ পনেরো বছর আগে। তিনি পয়গম্বর, ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ। তাঁর আগেও আরও কয়েকজন পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করেন: আব্রাহাম, মোজেস, আইজাক —মুসলমানরা বলেন হজরত ইব্রাহিম, হজরত মুসা, হজরত ইসাক। এমনি আরও একজনের নাম হজরত ইসমাইল। তাঁর জন্মের পর মা একটুখানি জলের জন্য হন্যে হয়ে ছুটোছুটি করেন। সাবা থেকে মারওয়া পর্যন্ত। ওদিকে সদ্যজাত শিশুটি মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে খুব হাত পা ছুঁড়ছিল। মা কিন্তু শূন্য হাতে ফিরে এসে দেখতে পেলেন। শিশুর পা দাপাদাপিতে তার পায়ের কাছে মাটি গেছে দেবে। আর সেইখান দিয়ে জল উঠছে। টলটলে পরিষ্কার জল। আজ তাই জুম জুম কূপ। আরবে নদীনালা বিল পুকুর কিছুই নেই। জুমজুম

সেখানে জলের এক আশ্চর্য উৎস, মক্কার লোকের অনেক অভাব মেটায়।

মক্কায় না যেতে পারার খেদ মনে চেপে জেড্ডা দেখে জাহাজ ফিরে এসে শুনতে পেলাম, রাজহংস আগামীকালই জেড্ডা ছাড়ছে। কাল যাদের বাইরে যাবার কথা ছিল তাদের মন খারাপ হয়ে গেল। খুবই স্বাভাবিক।

জেড্ডায় নেমে আরবদেশ খানিকটা দেখে নেবার সুযোগ অনেকের হল না বটে, তবে একটা আশ্চর্য কথা সবাই শুনে ভারি রোমাঞ্চিত হয়েছে। প্রায় রূপকথা—কোন কোন অপরাধের জন্য আরবে এখনও কাজীর বিচার হয়। এবং বিচারে অপরাধী নির্ঘাত মৃত্যুদণ্ড পায়। দিনে দুপুরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে জহ্লাদ তার গলা কাটে। শুক্রবারের পবিত্র দিনে। আজও!

॥ ১৩ ॥

আমরা জেড্ডা ছেড়েছিলাম বেলা সাড়ে বারোটায়। অন্য দিনের তুলনায় তখন অনেক বেশী গরমবোধ হচ্ছিল। জাহাজে তখন কাজ গুছিয়ে নেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। ডেকের পরে অকেজো বাক্স, ভাঙা কাঠ, বাজে কাগজের জঞ্জাল জমে ছিল; তাছাড়া বিগত কয়দিন তরকারির খোসা, মাছের কাঁটা, ডিমের খোলা, দৈয়ের ভাঁড়, জামের কৌটা এন্তার জমা হয়ে গিয়েছিল। ডকের জলে তো আর এসব ফেলার নিয়ম নেই; তাই খোলা সাগরে সব ফেলে দেওয়া হচ্ছে। কেউ কিছু বলবার নেই।

রাতে লোহিত সাগরের আকাশ আশ্চর্য লাগছিল/পৃথিবীর কোন আকাশে কখনও এত তারা দেখি নি। মাথার উপর খুব বড় একটি ছায়াপথ আরব থেকে মিশরের আকাশ পর্যন্ত ধনুকের ক্যার মতো বিস্তৃত—বৃহস্পতি মিশরের দিকে, পশ্চিমাকাশে। তখন জাহাজ থেকে

আরবের উপকূল ষাট মাইল। মিশরের উপকূল বাষট্টি মাইল দূরে। রাত তখন সাড়ে আটটা। অনেক জাহাজ চলছে। লোহিত সাগরে চলতেই মনটা বলে অকূল সাগরে আমরা একা নেই। কারণ লোহিত সাগর খুব সরু/সবার আনাগোনা চোখে পড়তে কতক্ষণ।

পরের দিনও আমাদের ভালই কাটল। জেড্ডা ছাড়ার পর চারশ মাইল চলে এসেছি। সমুদ্র শান্তশিষ্ট পুকুরের মতো। গরম কিছু বেড়েছে, কিন্তু সইতে কোন কষ্ট হচ্ছে না। টি-ভিতে দিব্যি ছবি আসছে; কোন মিশরী শহর থেকে। সন্ধ্যার পর সমুদ্র আরও মধুময় লাগছিল, আকাশের তারারা ছিল জেগে, চাঁদ ছিল আকাশে। দশমীর চাঁদ। কিন্তু চাঁদের আলোয় জোর ছিল না।

এবার বাঁদিকের ছ'মাইল দূরে একটি দ্বীপ, আর ডাইনে রয়েছে সিনাই মরুভূমি মাঝপথে অসংখ্য জাহাজ। সমুদ্রের চলতি পথ আলোয় ভরে গেছে/এযেন কলকাতার পথে মোটরগাড়িগুলো হেড লাইট জ্বেলে বরযাত্রী নিয়ে এগোচ্ছে। দেখতে আশ্চর্য লাগছিল সিনাই মরুভূমির সাগরতীর সেখানকার তৈলকূপে জ্বলছিল ভারি সাইজের লাল আলো। পরপর তিনটি। লকলকে আলোর শিখা আকাশে উস্কে দিয়ে তৈলকূপগুলো যেন সবাইকে ধমক দিয়ে বলছিল সাবধান, এদিকে এগিও না! এই তেলকূপগুলো মিশরের; ইসরাইল একদিন দখল করে নিয়েছিল, মিশর আবার ফিরে পেয়েছে। এখানকার তেল বেচে মিশর অনেক পয়সা পায়।

চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখবার মতো দৃশ্যই বটে—নিশ্চুপ একটি রাত, তৈলখনির করম্চালাল আলো, চলন্ত জাহাজগুলোর লাল নীল আলো, চাঁদের জ্যোৎস্না, আকাশের তারা নক্ষত্র, মিষ্টি মিষ্টি হাওয়া সব মিলে যেন অমরাবতীর ঐক্যতান। রাজহংস জাহাজে নিশাচরের মতো জেগে থেকে ভাবছিলাম, আমরা কি এই মাটির পৃথিবীতেই রয়েছি, নাকি অন্য কোন গ্রহ লোকের মায়াপুরীতে। যে আরব দেশের রাস্তায় দাঁড়িয়ে জহ্লাদরা লোকের গলা কাটে, সেই রূপকথার দেশ থেকে আমরা যেন এবার কোন উপকথার রাজ্যে পৌঁছে গিয়েছি!

আরও খানিক এগিয়ে এসে একটি মজার দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি সাগর যেন আর সমুদ্রটি নয়, একটি গোল সরোবর তার পাঁচশ গজ দূরে দূরে এক একটা জাহাজ গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ; আমরা রয়েছি সরোবরের মাঝখানটিতে। আকাশে তারারা তখনও জ্বল জ্বল করছে কিন্তু সপ্তর্ষি আর ধ্রুবতারাকে খুঁজে পাচ্ছি না বলে মনটা খারাপ হল ; মনে পড়ল বাংলার আকাশের কথা। সেখানে যেন খুব সহজে সপ্তর্ষিকে খুঁজে পাওয়া যায়, যদিও রাত বাড়লে সপ্তর্ষি স্থান পাল্টায় কখনও মনে হয় চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, কখনও মনে হয় যেন শির্ষাসণ করে বসে আছে।

জেড্ডা ছাড়ার তৃতীয় দিনে রাজহংস নোঙর ফেলল সুয়েজ খালের মুখ থেকে চার মাইল দূরে। আজ আমাদের নোঙরেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কারণ আমরা এসেছি বেলা নটায়। আজ যে সব জাহাজের খাল-প্রবেশের পালা তারা যাত্রা শুরু করেছিল ভোর সকালে।

আমাদের খেদমদ করার লোকের অভাব নেই; সুয়েজ বন্দর থেকে লঞ্চ নিয়ে লোক এসে বলছে চল, তোমাদের পিরামিড দেখিয়ে আনব। মাথাপিছু দক্ষিণা চারশ টাকার মতো। আমরা টোপ না গিলে আর পারলাম না, কারণ আমাদের গরজ ছিল খুব। পিরামিড দেখার গরজ।

সুয়েজ থেকে মোটর রথে বসে এবার আমরা এসেছি কায়রোতে। পিরামিডের ঠিক সমনাটিতে। বাইরে থেকে বার কয়েক পিরামিডের এদিক ওদিক দেখে অপলা মুখার্জী হঠাৎ বললেন এমন কি আর আহামরি দেখতে। ওঙ্গা কি বলবে ভেবে পেলে না, কারণ ওর দৃষ্টি তখন উটের দিকে। উটের পিঠে উঠে অনেকেই তখন ছবি তুলছে। পিরামিডে এ এক মজার খেলা ভারত, জাপান, আমেরিকা ইত্যাদি দেশ থেকে এলে কি হবে সবাই পিরামিড দেখে নিয়ে মাথায় ওড়না পরে, শেক সাজে, উটের পিঠে উঠে ছবি তোলে। উটওয়ালা আর ছবি তোলার লোক তো ক্যামেরা নিয়ে তৈরী রয়েছেই। পয়সা দাও, ছবি তোল।

ডাইনে মরুভূমি তখন ধূ ধূ করছে। সাহারা মরুভূমি। বেলা একটা বেজে গিয়েছে। আমরা তো ভেবেছিলাম না-জানি কত গরম হবে। ভাগ্যিস তেমন গরম ছিল না। টিকেট কেটে আমরা এগিয়ে চলেছিলাম পিরামিডের মধ্যে। খুব সরু সিঁড়ি ভেঙে ক্রমশ উপরে উঠছিলাম। পাশে ছিল আর একটা ছোট সিঁড়ি। উপরে দেখা শেষ করে সবাই ঐ সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিল। পিরামিড যখন তৈরী হয় তখন এই সিঁড়ি দুটো ছিল না। পাথর কেটে কেটে এই যুগের মানুষ সিঁড়ি তৈরী করে উপরে উঠছে। কোথায় কি আছে দেখতে।

আমাদের পেছনে ছিল আরও কিছু ভারতীয় লোক। তাদের সঙ্গে ছিল গাইড। সিঁড়ি ভেঙে প্রায় দশ ফুট এগিয়ে এক মহিলা বললেন—উঃ, মাথা ঘুরছে, আর উঠতে পারব না।' ভদ্রমহিলা এক রেডিও অফিসারের স্ত্রী, ভারতীয় জাহাজ মহাদিগ্‌বিজয়ের। মহাদিগ্‌বিজয় এখন মিশরের আলেকজাণ্ড্রিয়া বন্দরে নোঙর করে আছে বলে তার জন পাঁচেক লোক মিলে দল বেঁধে এসেছেন পিরামিড দেখতে। জাহাজী ছাড়া অবশ্য আরও অনেক লোক এসেছেন পিরামিডে—পৃথিবীর অনেক দেশ থেকেই।

এবার আমরা বড় একটি হলঘরে এসে পড়েছি। সিঁড়ির শেষ ধাপে। সমস্ত পিরামিডটিতে ঘর বলতে শুধু এই একটিই। এই ঘরে একদিন মিশর দেশের এক রাজার মৃতদেহ মমী করে রাখা হয়েছিল; তাঁর অনেক সোনাদানা টাকাপয়সাও এখানে ছিল। তাঁর মাথার নিচে ছিল একখানা বই। প্যাপাইরাস কাগজে লেখা রাজার কতজন দাসদাসী, লোকলস্কর, কত জমিজমা ছিল তার সব বিবরণ লেখা ছিল এই বইয়ে। এখন সে সবই কাইরো মিউজিয়ামে।

ছাদের কোণে আঙ্গুল বাড়িয়ে গাইড বলল—'ঐ দ্যাখো একটি ফোকর; পিরামিড তৈরীর সময়েই ওটি করা হয়েছিল।'

খুব আগ্রহ নিয়ে আমরা বললাম--কেন?

বারে, ফাঁক ফোকর না থাকলে মৃত রাজার আত্মা ঘরে ঢুকবে কি করে?

আমরা হাঁ করে রইলাম। রাজা মরে গেছে তাঁর আত্মাই বা কোথায় আর কেনই বা এসে এই ঘরে ঢুকবে আমাদের তা মাথায় খেলছিল না। গাইডই শেষ পর্যন্ত সব খুলে বলল—গাইডের কাছেই শুনতে পেলাম, রাজার হুকুমেই তাঁর মৃতদেহে আরক মেখে মমী করা হয়েছিল, ছাদের কোণে ছিদ্র রাখা হয়েছিল, যাতে আত্মাটা এসে তাঁর মমীদেহে আবার ঢুকতে পারে। আর আত্মা আবার দেহে ঢুকতে পারলে রাজা বেঁচে উঠবেন, আবার তার সব দাসদাসী, সোনাদানা, জমিজমার দখল নেবেন আবার রাজ্য সুখ ভোগ করবেন। পিরামিড তো এইজন্যই এমন করে তৈরী হয়েছিল, যাতে ভাঙচুর করে চোর ডাকাত ভেতরে যেতে না পারে, লুটপাট করতে না পারে।

এ হচ্ছে চারহাজার আটশ বছর আগের কথা। রাজার আত্মা আর তাঁর মমীদেহে প্রবেশ করতে পারে নি। রাজামশাই এবং তাঁর আপন লোকের ভূতগুলো হয়তো দু'পাঁচশ বছর এই ঘরের কাছে কাছেই ঘুর ঘুর করছিল, তারপর একদিন কেটে পড়েছিল। নইলে ষাট বছর আগে পাথর কেটে সিড়ি বানিয়ে এই ঘরে ঢুকতে পণ্ডিত লোকদের তারা বাধা দিত!

সেই প্রায় পাঁচহাজার বছর আগের কথা। তখন আজকের মতো ক্রেণ ছিল না, ট্রেন ছিল না। আটশমাইল দূরের পাহাড়ে বসে পাথর কেটে এনে পর পর বসিয়ে ঐ পিরামিড গড়া হয়েছিল। এখনও তা টিকে আছে! এসব কথা জানলেই তো মনে হয়, পিরামিড এক আশ্চর্য বস্তু।

পিরামিডের সামনে আরও একটি আশ্চর্য বস্তু আমরা দেখলাম স্ফিঙ্কস্। সিংহের দেহে মানুষের মাথা। পণ্ডিতরা এখনও তার রহস্য ভেদ করতে পারেন নি।

পিরামিড দেখে কায়রো ঘুরে জাহাজে এসে মনে হল, টাকা খরচ আমাদের সার্থক হয়েছে।

॥ ১৪ ॥

এবার আমরা সুয়েজ খালেয় মুখে এসে পড়েছি। খাল-পাইলট জাহজে উঠলেন। নাম তাঁর আর না উটি। মহসীন সাইদ আরনা-উটির গায়ের রং সাদা, বয়স সাঁয়ত্রিশ, দেখলে মনে হয় বত্রিশের বেশি নয়। সুয়েজ-পাইলট হবার আগে মহসীন ছিলেন রাজহংসর মতো একটি বড় জাহাজের ক্যাপটেন। জাহাজে কাজ করতে করতে সারা পৃথিবী তাঁর দেখা হয়ে গেছে।

এখন আমরা খালের মধ্যে এগিয়ে চলেছি। আগে ছিল এখানে সিনাই মরুভূমি। তখন চীন জাপান ভারত থেকে ইংলণ্ড আমেরিকায় যেতে হলে উওমাসা অন্তরীপ ঘুরে যেতে হত। ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে খাল কাটা হয়; ভূমধ্যসাগর আর লোহিত সাগরের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল খাল বেয়ে লোহিত সাগর থেকে ভূমধ্য সাগরে সরাসরি যাতায়াতের ব্যবস্থা হল। খাল তখন একশ মাইল লম্বা, দুইশ ফুট চওড়া। ভারত থেকে উওমাশা ঘুরে ইংলণ্ডে যেতে যে সময় লাগত, খাল কাটার পর তার দশ দিন কম লাগল।

সুয়েজ খাল কেটেছিলেন ফার্ডিনাণ্ড্ লেসেপস্। ফরাসী এঞ্জিনীয়ার। আগে খালের ভাগীদার ছিল ফ্রান্স আর মিশর। পরে কায়দা কৌশল করে ইংরেজরা আসল মালিক হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত বিবাদ শুরু হল প্রেসিডেণ্ট নাসেরের আমলে। সে কথা পরে বলছি।

লোহিত সাগরের মুখ থেকেই খালপারে সুন্দর সুন্দর দালান কোঠা চোখে পড়ে; পার্ক বাগানও কিছু কম নেই। ডাইনে কেবলই মরুভূমি, তবে বালুকাময় নয়—বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে স্তরে স্তরে বালু জমাট বেঁধে আছে। ঝর ঝরে বালু হলে বিপদ ছিল—হাওয়ায় সব সময় ধূলি উড়ত, খাল চেয়ে আর এগোনে যেতো না। এই মরুভূমিকে

মিশরীরা বলে সী-না, আমেরিকানরা বলে সাই-নাই। আমরা সব সময় সিনাই বলেই উল্লেখ করব।

আট মাইল বেগে রাজহংস এগিয়ে চলেছে; খালে এর চাইতে বেশি জোরে জাহাজ চালাবার হুকুম নেই। এবার বাঁদিকের খাল ধারে কিছু বাড়িঘর। কিছু গাছপালা, কিছু চাসবাসও দেখা যাচ্ছে। এরই মধ্যে আমরা একটি গ্রাম পেরিয়ে এসেছি, নাম তার শালুকা। এবার ইউক্যালিপট্যাস আর খেজুর গাছের সার, গমের ভূঁই, লেটুস-বাঁধাকপি-টমাটোর আবাদ চোখে পড়ছে—খালের ডানতীরে একটা কুশঘাস পর্যন্ত নেই। বাঁ তীরের চাষের কাজে অবশ্য অনেক যত্ন কেয়ারী করতে হয়, পয়সা খরচা করে অনেক জল ঢালতে হয়। সমুদ্রের লোনা জলে আবাদের কাজ চলে না। এই সব মরুভূমির দেশে মিঠা জলের বড় দাম। এখানে মিঠা জল আসে নীলনদ থেকে।

খালের জলে সবুজের ভাগ বেশি, নীলেব ভাগ কম। এখন জোয়ার চলেছে, ভূমধ্য সাগর থেকে জোয়ারের জল খাল বেয়ে লোহিত সাগরের দিকে এগিয়ে চলেছে। ধীর লয়ে। এ কলকাতার গঙ্গায় জোয়ার নয় যে, বঙ্গোপসাগর থেকে উঠে এসে কলকাতার কাছে গিয়ে গায়ের জোরে কুড়ি ফুট উঁচু হয়ে সোঁ সোঁ করে এগিয়ে যাবে।

পাইলট আরনাউটি আমাদের সঙ্গে টুকটাক আলাপ করছেন ; কিন্তু বড় হুঁসিয়ার। জাহাজের মাথা যাতে খালপারে গিয়ে না ঠেকে তার জন্য কখনও একটু বাঁয়ে, কখনও ডাইনে মাথা হটিয়ে নিচ্ছেন। কেবলই তাকে বলতে হচ্ছে পোর্ট ফাইভ, কিংবা স্টারবোর্ড সেভেন। চক্রধারী হুকুম তামিল করে যাচ্ছে।

কথায় কথায় তার ঘরের কথা এসে গেল, কিছু ব্যাক্তিগত কথা। ওঙ্গার বয়সী তার একটি মেয়ে আছে। নাম তার মারওয়া। মারওয়া এখন আমাদের চেনা নাম ; মক্কার জুম জুম কূপ প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে, হজরত ইসমাইলের মা জলের সন্ধানে সাবা থেকে মারওয়া ছুটোছুটি করছিলেন। নামটি মহসীন আর নাউটির খুব পছন্দ বলে নিজের মেয়ের নাম রেখেছেন মারওয়া! মারওয়ার জন্মের সময়েই

তার মা মারা গেছে—বেচারা মারওয়া। মহসীন সাহেব মেয়েকে খুব ভালবাসেন ; তাই বৌ মরে গেলে আর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন নি। মারওয়া থাকে কায়রোতে, তার দাদীর সঙ্গে। সুয়েজখালে মহসীন সাহেবের একটানা দশদিন ডিউটি, তারপর আবার একটানা দশদিন ছুটি। মহসীন আরনাউট ছুটিতে চলে যান কায়রোতে—দশদিন পর পর নিজের মা আর মেয়েকে দেখে তার বড় ভাল লাগে।

এবার খালধারের সিনাইয়ে ভাঙাচোরা হাড় বেরকরা মোটর গাড়ির খাঁচা পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। এ সব হচ্ছে ১৯৬৭ এবং ১৯৭৩ সালে খালধারে যুদ্ধের চিহ্ন। মিশরে-ইসরাইলে যুদ্ধ। আরব, সিরিয়া, জর্ডন, মিশর ইত্যাদি নিয়ে আরব মুল্লুক। এই যুদ্ধে মেটামুটি সবার যোগাযোগই ছিল—আর এজন্য একে আরব-ইসরাইল যুদ্ধ বলে।

আমরা আগেই বলেছি, ইংরেজ শেষপর্যন্ত সুয়েজখালের মালিক হয়ে বসে পড়ে। আবদেল গামেল নাসের মিশরের প্রেসিডেন্ট হলে সুয়েজ খালকে মিশরের সম্পত্তি বলে ঘোষনা করেন। ১৯৫৬ সালে। ইংরেজ-ফরাসী-ইসরাইলের সঙ্গে মিশরের যুদ্ধ বেঁধে যায়। ইংরেজকে শেষ পর্যন্ত সুয়েজখাল হারাতে হয়।

১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম হলে তার চার ঘণ্টার মধ্যে মিশর-জর্ডন-সিরিয়া ইত্যাদি আরব রাষ্ট্র মিলে ইসরাইল আক্রমণ করল, কিন্তু হটে গেল। ১৯৬৭ সালে আবার সবাই মিলে ইসরাইলকে আক্রমণ করল। ইসরাইল এবার মিশরের পেছু ধাওয়া করে সুয়েজ খাল পর্যন্ত চলে আসে। খাল ধারে ভারি যুদ্ধ হয়—অনেক বোমা পড়ে সুয়েজখালে, অনেক উড়োজাহাজ ভেঙে পড়ে ; মোটরগাড়ি, সাজসরঞ্জাম, রসদ ইত্যাদি খালের জলে পড়ে যায়। কিছু জাহাজ-ডুবিও হয়। সুয়েজখাল যায় বন্ধ হয়ে। পৃথিবীর সব জাহাজ তখন চলতে থাকে উত্তমাশা ঘুরে, খাল তৈরীর আগে যেমন চলত।

আটবছর বন্ধ থাকার পর আবার সুয়েজ খাল খুলে যায়। ১৯৭৫ সালে। পৃথিবীর সবদেশের জাহাজ আবার চলতে শুরু করে সুয়েজ

খালের জলে। খাল পরিষ্কার করতে কোটি কোটি টাকা খরচা হয়। সিনাইয়ে মোটর গাড়ির খাঁচা পড়ে থাকতে দেখে আমাদের সুয়েজের সব ইতিহাস, সবকথা মনে এলো; বলার মতো কথা বলে বলতেও হল।

এবার আমরা বীটার লেকে এসে পড়েছি। এগারো মাইল লম্বা, সাড়ে সাত মাইল চওড়া একটি হ্রদ, সুয়েজ খাল এসে তার সঙ্গে মিশেছে। হ্রদের জল কুটিল নীল, তাতে লবনের ভাগ খুব বেশি বলে তেতো। এখানে সাতাশটি জাহাজ এসে নোঙর করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের পথ করে দিতে। ভূমধ্যসাগর থেকে উঠে এসে ঐ জাহাজ গুলো সুয়েজ খালে ঢুকেছিল দুটি কনভয়ে-রাত একটায়, সকাল ছটায়। ওদিকে আমরা এসেছি লোহিত সাগর থেকে, মোট একত্রিশটি জাহাজ নিয়ে—সকাল আটটা থেকে জাহাজগুলো পর পর ছেড়ে এসেছে। বীটার লেকে না দাঁড়িয়ে আমাদের একত্রিশখানা জাহাজ পর পর ভূমধ্যসাগরের দিকে চলে গেল। তারপর বীটার লেকের জাহাজগুলো নোঙর তুলে এগিয়ে গেল লোহিত সাগরের দিকে।

সুয়েজ খালের এখন অনেক সংস্কার করা হয়েছে। দুশ ফুট থেকে বাড়িয়ে এখন ৫৬৫ ফুট চওড়া করা হয়েছে। আমাদের রাজহংসর মতো শুধু বারো-তেরো হাজার টনের জাহাজই নয়—এখন দেড়লাখ টনের জাহাজ সুয়েজ খালে যাতায়াত করতে পারে। কিন্তু তাই বলে দুটো জাহাজ পাশাপাশি একই সঙ্গে যেতে আর আসতে পারে না—বীটার লেকে একদলকে দাঁড়িয়ে পথ দিতে হয়।

বীটার লেকের পর থেকে খালধারে সবুজের ভাগ কিছু বেশি দেখা যাচ্ছে। এমনকি দু'একটা আমগাছ পর্যন্ত চোখে পড়ছে। আকাশে কিছু মেঘও রয়েছে। এবং সে-মেঘের রং কালো অর্থাৎ ওতে জল আছে—হয়তো একটু বৃষ্টিও হতে পারে। এসব দেশে বৃষ্টি হলে লোকের আনন্দ আর ধরে না। এ-যেন গরিবের ঘরে মাংস ভাতের দিন!

ইস্‌মাইলিয়াতে মহসীন আর নাউটি চলে গেলেন; এবার এলেন আর এক পাইলট, মহম্মদ কামাল হাশিশ। হাশিশের বাড়ি ইস্‌মাই-

লিয়াতেই, খালে কাজ করছেন বিগত আঠাশ বছর। বুড়ো হলেও বাড়িতে বসে থাকতে ভাল লাগে না। তাই চাকুরি করছেন। খাল ধারে একটি বাড়ির দিকে হাত বাড়িয়ে হাশিশ বললেন—'ঐ দ্যাখো, প্রেসিডেন্ট সাদাতের বাড়ি, তাঁর গ্রীষ্মাবাস। 'আলেকজাণ্ড্রিয়া, কায়রো লুকসর ইত্যাদি অনেক জায়গাতেই সাদাতের বাড়ি আছে, মোট নাকি বারোখানা। সে যাক।

নাসেরের পর মিশরের প্রেসিডেন্ট হন আনোয়ার সাদাত। তাঁর সম্বন্ধে কিছু গল্প আছে। যুবক বয়সে তিনি নাকি ছিলেন খুব গান্ধীভক্ত, মহাত্মাজীর মতো করে ধুতি পরতেন, মাথায় দিতেন গান্ধীটুপি। নিরামিষ খেতেন। গান্ধীর মতই অবশ্য তিনি গুলীর আঘাতে প্রাণ হারান।

সিনাই প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—আমাদের খাল অতিক্রম শেষ হবার পথে। ডানদিকে বেশ কিছু বাড়ি ঘর দেখা যাচ্ছে, মরুভূমির মধ্যে একটি গ্রাম—ঐ গাঁয়ের নাম কাণ্ডারা। পূব কাণ্ডারা আর পশ্চিম কাণ্ডারা। ঐখানে একদিন হাতাহাতি যুদ্ধ হয়েছিল, হাশিশ বললেন—আমাদের সঙ্গে ইসরাইলীদের।

সন্ধ্যা বয়ে গেছে। সুয়েজখালের শেষ সীমায় আমরা পৌঁছে গিয়েছি। যাদের কনভয় লোহিত সাগরে যাবে, তাদের পক্ষে এখানে খালের শুরু। একটু আগে ভূমধ্যসাগরে সূর্য অস্ত গেছে—পোর্ট সৈয়দ বন্দর আলোকমালায় সজ্জিত হয়ে উঠেছে। ওখানে যেন কোন উৎসব চলছে। পোর্ট সৈয়দ খুব জীবন্ত বন্দর। যেন ডেকে কথা কয়ে ওঠে। ভূমধ্যসাগর তীরে আলো জ্বেলে পোর্ট সৈয়দ খলখলিয়ে হেসে ওঠে।

সুয়েজ থেকে পোর্ট সৈয়দ খাল পথে দশ থেকে বারো ঘণ্টার মামলা। আমাদের দক্ষিণা কত দিতে হয়েছে? পাঁচ লাখ টাকার উপর।

॥ ১৫ ॥

তিন দিন হল আমরা ভূমধ্যসাগরে চলেছি। সবার বেশ ঝরঝরে লাগছে—যেন এবার খুব আনন্দে দিন কাটবে। যতো অশান্তি, যতো কোলাহল যেন সুয়েজের ওপারে। বৃষ্টিবাদল, বন্যা, ট্রামবাসের ভিড়, মারামারি ইত্যাদি থেকে আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি এবার যেন কাউকে আর আমাদের পরোয়া করতে হবে না!

ভূমধ্যসাগরে খুব উড়ন্ত মাছ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—পুঁটি মাছের মতো ছোট ছোট মাছ, ঝাঁক বেঁধে জল থেকে খৈয়ের মতো ছিটকে উঠে খানিক উড়ছে, তারপর আবার জলের মধ্যে পালিয়ে যাচ্ছে। বড় মাছগুলো উড়ছে একটা করে! জাহাজের আড়া আড়ি উড়তে গিয়ে এগুলো বিপদে পড়ে, লোহার তারে ঝটকা লেগে পড়ে যায়। ডেক ভাণ্ডারী এই মাছ খাওয়ার যম, সকাল বেলায় ডেক থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ভেজে ফেলে। বড় সাইজের এই মাছগুলো দেখতে অনেকটা বাটা মাছের মতো, চোখ দুটো বড় বড়, পাখা দুটো ঘাড় থেকে একেবারে লেজ পর্যন্ত লম্বা! খেতেও বেশ লাগে।

উড়াল মাছ নিয়ে রেড়িও আঙ্কেলের সঙ্গে আজ সকালেই ওঙ্গার কথা হচ্ছিল, রেড়িও আঙ্কেল বলেছিল 'মাছগুলো দেখতে বেশ ভালো।'

ওঙ্গা বলছিল—'হ্যাত, ভাল না হাতি। মাছের আবার পাখা থাকে নাকি?'

'পাখা না থাকলে ওরা উড়বে কি করে?'

'ইস, ওকে আবার ওড়া বলে নাকি, উঠেই তো ডুব দেয়।'

'মোটেই না, উড়ে ওরা চল্লিশ পঞ্চাশ গজ পর্যন্ত চলে যায়। আধ মিনিট ধরে ওড়ে।'

'কিন্তু ওরা তো পাখি নয়, ওড়ার দরকারটা কি?

রেডিও আঙ্কেল হাসতে থাকে। মাছের উড়ে বেড়ানোর দরকার আছে কিনা তার জবাব যে শুধু মাছেরাই দিতে পারে!

রাত নটা বাজে। মাল্টা দ্বীপ পেছনে ফেলে রাজহংস এগিয়ে চলেছে কারও ক্যাবিনে কোন সোরগোল নেই। হেলম্‌স্‌ম্যান রঞ্জণ চট্টরাজ এবং গ্রীজার চীমনলাল ডিউটি সেরে এসে শুয়ে পড়েছে' ভোর চারটায় উঠে আবার ওদের ডিউটিতে যেতে হবে। রাত বারোটা চারটে ডিউটিওয়ালারা ঘুমিয়ে পড়েছে আরও আগে সন্ধ্যা সাতটায়। সন্ধ্যা ছটার পর সবাই রাত-খাবার খেয়ে নেয়—অফিসার ক্রু সবাই। বাড়িতে গেলে মা বলে ক্ষিধে পায় না? তোদের রাত কাটে কি করে? ছেলে হাসে, হাসতে হাসতেই বলে আমরা যে জাহাজী!

ডেক সারেঙ অরুণ মিত্রর ক্যাবিনে ছোট খাটো একটি আড্ডা বসেছে। ডেক-কসব্ পলাশ রায়, এঞ্জিন সারেঙ রাবণ দত্ত, জন দুয়েক সীম্যান খেয়েদেয়ে চলে এসেছিল অরুণ মিত্রির ক্যাবিনে। তাস খেলতে। কিন্তু খেলার বদলে সবাই গল্প নিয়ে মেতে উঠেছিল, যতো সব দেশবাড়ির গল্প। রাবণ দত্তর বাড়ি মালদায়। সেখানে তার ধানী জমি আছে, আমবাগান আছে, দুইদুটো মাছের পুকুর আছে। কিন্তু বাড়ির খবর ভাল নয় বৃষ্টিবন্যায় অনেক ফসল নষ্ট হয়েছে, মাছগুলো ভাসা পুকুর থেকে বেরিয়ে গেছে।

হর্ষ চৌধুরী এখনও নতুন বলে সবার সব কথা শুধু শোনে, নিজের কথা তেমন বলে না। রাবণ দত্ত নামটা তার কাছে খুব অদ্ভুত ঠেকে। এমন নাম সে কখনও শোনে নি। দত্ত মশাইয়ের আসল নাম রাবণারি, যার অর্থ রাবণের অরি বা শত্রু—রামচন্দ্র। কিন্তু শুধু হর্ষ চৌধুরী নয়, কোন ভাই লক্ষ্মণই সে অর্থের ধার কাছে না গিয়ে রাবণ দত্ত নাম নিয়ে মস্করা করে। দেশ গাঁয়ে, জাহাজে, সর্বত্র!

জেড্ডায় পৌঁছে প্রায় সবাই বাড়ির চিঠি পেয়েছিল। সে-চিঠি বারকয়েক পড়াও হয়ে গেছে। ডেক সারেঙের ক্যাবিনে বসে সবাই আবার সেই পুরানো চিঠিতে পাওয়া খবর নিয়ে আলোচনা করছিল। বাড়ির কথা। ঘরের কথা শুধু অন্যকে যতটুকু বলা যায়, তাই।

অফিসারদের ক্যাবিনগুলোর সাড়াশব্দ নেই। ডিউটির পর চান টান সেরে চিফ অফিসার মিণ্টু মৈত্র ও সেকেণ্ড এঞ্জিনীয়ার ইব্রাহীম জাফর খাবার নিয়ে বসেছেন। জাহাজ সমুদ্রে থাকলে দুজনের কেউই ছটায় খাবার টেবিলে যায় না। স্টুয়ার্ড তাদের খাবার রেখে দেয় হটপ্রেসে। দুজনই চারটা-আটটা ডিউটি করে এসে তবে খাবার খান। মুখোমুখি বসে গল্প, আর গল্প করতে করতে খাওয়া চলে। রোজ।

তিন-সাব রাকেশ কাপুর, সেকেণ্ড অফিসার প্রদীপ খান্না এখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। রাত বারোটায় উঠে তাঁদের ডিউটিতে যেতে হবে। চিফস্টুয়ার্ড ব্র্যাগাঞ্জা আপন ক্যাবিনে বসে আগামীকালের ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনারের মেনু তৈরী করছে, বেশ মনোযোগ দিয়ে। কারণ আছে।অফিসারদের মেস-কমিটি তাকে জানিয়ে দিয়েছে খাবার নিয়ে অনেকের মনেই অনেক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে মাংসের ঝোলে এত ঝাল কেন, মুগডালে কেন পেঁয়াজ দেওয়া হয়, ক্যারামেন কস্টার্ড এত কম দেওয়া হয় কেন, পুডিং তেমন ভাল হয় না কেন ইত্যাদি। চিফকুক ডিসিলভা এখন চিফস্টুয়ার্ডের সামনেই বসে আছে, মেনু তৈরীর সময় তাকে হাজির থাকতেই হয়। রান্না সম্বন্ধে চিফকুকের কৈফিয়ত একটিই সেকেণ্ড কুক, থার্ড কুক নতুন, আমি একা কি করব! একথা শুনে সেকেণ্ড কুক গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী খুব রেগে আছে। সে সাফ জানিয়ে দিয়েছে, বি-আই, সিটি লাইনে বারো বছর কাজ করার পর সে এসেছে রাজ কোম্পানীতে। সুতরাং রান্নার কাজ জানতে আর তার বাকি নেই!

রাজহংস এখনও ভালই চলছে বলতেহবে। কোন বন্দরে এ পর্যন্ত অনর্থক দেরি হয় নি মেইন এঞ্জিন, অক্জিলারি এঞ্জিনগুলো মোটামুটি ভালই কাজ করেছে। বড়া সাহেব অশোক মেনন ক্যাবিনে বসে ওঙ্গার লেখাপড়া কদ্দূর এগিয়েছে দেখছিলেন। ওর খাওয়াটাই এখন বড় সমস্যা এখনও পুডিং ছাড়া কিছু খেতে চায় না। এখন আর নিচে গিয়ে রাবণদত্তর সঙ্গে ওঙ্গা খেতে বসে না, তবে দেখা হলে তাকে 'হ্যালো' বলে।

জাহাজ এগিয়ে চলেছে জিব্রাল্টারের দিকে। জাহাজ চলাচল এদিকে খুব বেশি। ইউরোপ আমেরিকা থেকে অনেক জাহাজ এই দিকে আসছে, অনেক জাহাজ ঐ দিকে যাচ্ছে। আমাদের দুইপাশে এবং আগেপিছে রেডার ছবি অনুযায়ী চল্লিশখানা জাহাজ রয়েছে। সবই দূরে দূরে। আলো দেখা যাচ্ছে মোটে পাঁচখানা জাহাজের।

ক্যাপটেন যখন তখন ব্রিজে এসে পড়ছেন, কখনও কম্পাস মিলিয়ে দেখছেন, জাহাজ ঠিক কোর্স অনুযায়ী চলছে কিনা। এইমাত্র ক্যাপটেন হাঁক দিয়ে বললেন—

থার্ড মেট ?

ইয়েস স্যার—

লাইফ বোট গিয়ার চেক করেছ ?

ইয়েস স্যার—

জরুরি অবস্থা দেখা দিলে ?

সব ঠিকমতো কাজ করবে স্যার—

এ হচ্ছে ক্যাপেটেনের আপন দুশ্চিন্তা—জাহাজ চলাচলের দুশ্চিন্তা, মালভরাট, মালখালাসের দুশ্চিন্তা, জাহাজের খাবার দাবার, স্বাস্থ্য, বিপদ আপদ ইত্যাদি সব কিছুর দুশ্চিন্তা তাঁর মাথায়, জাহাজ সমুদ্রে থাকলে ভাবেন ঠিকমতো বন্দরে গিয়ে পৌঁছাবে তো ?

চিফ এঞ্জিনীয়ারের অবস্থা একই ; কেবলই তাঁর মনে হয়, ঐ বুঝি জেনারেটর এঞ্জিন বিকল হল, ঐ বুঝি তিন নম্বর পিস্টন রিং ভেঙে গেল, ইস্, পাঁচ নম্বর সিলিণ্ডার থেকে যেন কেমন আওয়াজ আসছে—

দুঃখের বিষয় শেষ পর্যন্ত একটি দুর্ঘটনা ঘটেই গেল—

রাত দশটা বেজে গিয়েছে। একি দুর্ভাগ্য ! স্মোক ডিটেক্টারে যে ধোয়া দেখা যাচ্ছে। সর্বনাশ। একনম্বর ফলকার মধ্যে যে আগুন লেগেছে ! হ্যালো, ক্যাপটেন স্যার—' আমার ফোন পেয়ে

ক্যাপটেন ব্রীজে এলেন। নিজ হাতে সুইচ টিপে আগুন লাগা ঘন্টি বাজিয়ে দিলেন।

জাহাজময় এক মিনিট ধরে ইলেকট্রিক বেলে বাজতে লাগল ক্রি ং ং ং—

॥ ১৬ ॥

আগুনের ঘন্টি শুনে জাহাজে ভিষণ সরগোল পড়ে গেছে। ঘুম থেকে যারা সদ্য জেগে উঠেছে তারা হতভম্ব—কি করতে হবে, কোথায় যেতে হবে কিছুই তারা বুঝতে পারছে না। জাহাজে আগুন লাগার কথা সবারই জানা আছে বটে, কিন্তু ব্যাপারটি আসলে কি, বিপদ কোথায় সেই ধারণা অনেকেরই থাকে না। কারণ এ রোজকার ঘটনা নয়, কালেভদ্রে জাহাজে আগুন লাগে।

তেলওয়ালা চীমনলাল জাহাজ চাকুরিতে নতুন নয়, কিন্তু আগুণ লাগার কথা শুনে কেঁদে ফেলেছে। আগুনের চেয়ে বড় ভয়ের বস্তু তার কাছে আর কিছুই নয়। হর্ষ চৌধুরী চালাক ছেলে, আগুনের কথা শুনেই সে লকার হাতরে সবগুলো টাকা তুলে নিয়ে পকেটে রেখেছে। নিজে বাঁচতে পারবে কিনা সে চিন্তা তার মাথায় আসে নি। সবাই ছুটোছুটি করছে। কেবিন ছেড়ে উপরে আসতে আসতে চিৎকার করে বলছে জাহাজের কোথায় আগুন লেগেছে? জবাব দেবার কেউ নেই—তখনও ব্রিজ ছাড়া কেউ জানেই না।

এঞ্জিন বিভাগের সব লোক এঞ্জিনঘরে চলে গেছে—অর্দ্ধেক লোক নিয়ে সারেঙ স্টারবোর্ড, বাকি লোক নিয়ে ট্যাণ্ডেল পোর্ট সাইডে গিয়ে মোতায়েম হয়েছে। এই নিয়ম। প্রাণ বাঁচুক আর না বাঁচুক নিয়ম পালন করতে হবে। নিয়ম পালন না করলে আগুন নিভানো যাবে না আগুন না নিভলে আর প্রাণ বাঁচবে কি করে?

ক্রিং ক্রিং ক্রিং ব্রিজ থেকে এঞ্জিনঘরে ফোন এসেছে হ্যালো এঞ্জিন-রুম, এক নম্বর ফলকায় আগুন লেগেছে তোমরা সবাই প্রস্তুত ?

চার সাব জবাব দিল সম্পূর্ণ প্রস্তুত। হ্যালো, হালো ব্রিজ শোন, এদিকে, কোন ত্রুটি নেই। হোজ পাইপগুলো ঠিকমতো কাজ করবে। হ্যাঁ গ্যারান্টি দিচ্ছি—

'ভাগ্যিস, এঞ্জিনঘরে আগুন লাগে নি রাবণ দত্ত মন্তব্য করল।

চার সাব বুদ্ধির প্যাঁচমারা জবাব দিতে পটু, এমনকি এই বিপদের মুখে দাঁড়িয়েও দিব্যি বলল—তাতে কি ? ডান পা কেটে গেলে কি আর কেউ বলে— আহা, যদি বাঁ পা কাটত !

শুধু এঞ্জিনের লোক নয়, সবাই আপন আপন কাজের স্থলে হাজির। চিফ অফিসার গেছেন অকুস্থলে, একনম্বর ফলকায় আগুন লাগার জায়গায়। সেখানেই তার কাজ, না গিয়ে উপায় নেই। পরণে রয়েছে তার স্মোক হেলমেট, হাতে কুড়োল। ক্যাডেট শর্মা ফলকার কাছে দাঁড়িয়ে স্মোক হেলমেটের পাইপে হাওয়া পাম্প করছে সেই হাওয়া টেনে চিফ অফিসারকে বেঁচে থাকতে হবে। ফলকার মধ্যে আগুন নিভানোর কাজ করতে হবে। এয়ার টাইট পোশাক পরা লোক হাওয়া না পেলে বাঁচবে কি করে।

লিখতে যত সময় লাগছে, অনেক কাজ এগিয়েছে তার চাইতে অনেক আগে ; ভেন্টিলেটারগুলোর মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে বাইরের হাওয়া ঢুকে আগুন ছড়াতে না পারে। জাহাজের মাথাও হাওয়ার গতির উল্টোদিকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। রাজহংস চলছে এখন খুবই অল্প বেগে, যাকে বলে ডেড স্লো এ্যাহেড।

ডেকের সীম্যানরাও বসে নেই, হোস পাইপ নিয়ে ফলকার কাছে তিন সীম্যান হাজির রয়েছে ; হুকুম পেলেই জল চালাবে। দুজন হাজির রয়েছে ফায়ার এক্সটিংগুইশার নিয়ে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, এসব কাজ সবাইকে করতেই হচ্ছে আগুন না নিভলে নিজের জীবনও বাঁচবে না যে !

এইসব কাজ নিয়ে সপ্তাহে সপ্তাহে আবার মহড়া দেওয়া হয়, ফায়ার

ড্রিল করে জিজ্ঞেস করা হয় তোমার কি কাজ ?

হোস পাইপ স্যার—

তোমার।

ফায়ার একস্টিংগুইশার—

তোমার।

স্ট্রেচার পার্টি—

তোমার, তোমার, তোমার ....

এদিকে লাইফ বোট পর্যন্ত নামানো হয়ে গেছে, লাইফ বোট এখন এমবারকেশন ডেকে ঝুলছে। কি জানি বলা তো যায় না, আগুন যদি না নেভানো যায়, জাহাজ ছেড়ে যদি পালাতে হয়—

হ্যাঁ, স্ট্রেচার পার্টিও বাদ নেই ফলকায় নেমে আগুন নেভাতে গিয়ে কেউ যদি আহত হয় ? স্ট্রেচার পার্টির লোক তাদের দেখবে, দরকার হলে তারাই তাদের লাইফ বোটে তুলে নেবে।

এক নম্বর ফলকায় নেমে সব দেখেশুনে চিফ অফিসার উঠে এসেছেন ; ফলকায় ছিল চায়ের পেটি, গানি ব্যাগ, ছোট যন্ত্রপাতি ভরা বাক্স। ভাগ্যিস স্টারবোর্ডের অল্প কিছু যন্ত্রপাতির বাক্সেই আগুন দেখা গিয়েছে ; তাও বেশিক্ষণের আগুন নয়। পোর্ট সাইডের চায়ের পেটি, পাটের গাঁট এখনও নিরাপদ ; তবে দেরি হলে আর রক্ষে ছিল না। যাহোক ফায়ার এক্সটিংগুইশাব দিয়ে আগুন নেভানো হল।

এবার জাহাজ আগের পথে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার আর কোন ভয় নেই। ক্যাবিনে ঢুকতে ঢুকতে প্রায় ক্রুদের সবাই বলেছে উঃ বাঁচা গেল ; সবাই তারপর গেজিয়ে গল্প শুরু করেছে। বাকি রাতটুকু যে ঘুমিয়ে কাটাতে হবে সে কথা যেন কারও মনেই হচ্ছে না। প্রায় সবার মুখেই একটি কথা শুনতে পাওয়া গেল—আমি মোটেই ঘাবড়াইনি !

'একি আবার একটা আগুন নাকি,' হঠাৎ মজিদ ট্যাণ্ডেলকে বলতে শোনা যায়। কাছেই দাঁড়িয়েছিল ইকবাল ; লেখাপড়া জানা ছেলে মাত্র দুবছর আগে জাহাজে কাজ করতে এসেছে। ইকবালের

জীবনে অনেক আশা—ভাল করে কাজ শিখবে, সেকেণ্ড মোটর পরীক্ষা দেবে, অফিসার হতে আর বাধা কোথায়। পাশ তো নির্ঘাত করবে। ইকবালকে মজিদ তেমন সুনজরে দেখে না। লেখাপড়া শিখে যেন সে খুব দোষ করেছে।

ইকবালই ট্যাণ্ডেলের কথায় ফোড়ন কাটল 'সেকি চাচা, আগুনের আবার ছোট বড় আছে নাকি।

'থাকবে না ক্যানে,' সামান্য খেকিয়ে উঠে মজিদ ট্যাণ্ডেল বলে—'আগুন দেখেছিলাম বটে টানা মার্সেনের জাহাজে'—

'কোন্ মার্চেন্ট।'

মজিদ ট্যাণ্ডেল অল্পচোখে ইকবালের দিকে তাকায়, তারপর কথায় কিছু ঝাঁঝ মিশিয়ে বলে 'তোমার কি তখন জন্ম হইল্‌চে। আমি তখন টানা মার্সেনের জাহাজে টোপাস—

ইকবাল হাসি গোপন করে. ওর খেয়াল হয়, টার্নার মরসিন কোম্পানীকে মজিদরা বলে টানা মার্সেন। অমায়িকভাবে ইকবাল মজিদের মুর্শিদাবাদী ভাষায় টান নকল করে বলে তা হলে সেই বড় আগুনের গল্পটা একটু হোক না ক্যানে—

মজিদ এবার সটান হয়ে দাঁড়ায়, ইকবালের কথা বলার ধরণ তার ভাল মনে হয় না; ছোঁড়াটা যে তার মুর্শিদাবাদী কথা নিয়ে মস্করা করে মজিদ তা জানে। মেদিনীপুরের ইকবালকে বড় বেতমিজ মনে হয়। তবু গল্প বলার লোভ দমন না করতে পেরে বলে 'আর লাগ তো লাগ, জাহাজের ফোক্‌ষলে রংগুদামে আগুন লেইগেছে; ভারি আগুন—

রং গুদামের আগুন আবার ভারি হলৈচে কিসে।

'তোমরা ছেলেপান জাহাজীরা তা বুঝবা না,' মজিদ বলে 'বলি রং তৈরী করতে হয় তেল গুলে বটে তো? তাইলে তেলেই আগুন লেইগে গেলচে, বটে কিনা ফোকস্লেল দাও দাও করে জ্বলতেছে—

তারপর।

ইকবালের তারপর বলার চিবানো ধরণ দেখে মজিদ রেগে যায়

তার মনে হয়, ছোঁড়া তাকে নিয়ে নিশ্চয় মস্করা শুরু করেছে। ইকবালের কথার জবাব না দিয়ে সে আপন ক্যাবিনের দিকে চলে যায়। নিঃশব্দ রাতের ভূমধ্যসাগরে দুজন জাহাজীর মধ্যে যে এমন কথাবার্তা হতে পারে পৃথিবীর কোন প্রান্তে বসে তা কেউ তখন কল্পনাও করতে পারছে না।

ওঙ্গা তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তাকে জাগানর মতো কোন কারণ দেখা দেয় নি। জাহাজে আগুন লাগা সম্বন্ধে অপলা মুখার্জীর কোন ধারণাই নেই। বড়া সাব ক্যাবিনে এলে তাই প্রথমেই প্রশ্ন করলেন—'আজ যদি ফলকার আগুন নেভানো না যেতো, তাহলে।

'তা হলে আগুণ ক্রমে ছড়িয়ে পড়ত,' শান্তভাবে অশোক মেমন বললেন—হয়তো সারা জাহাজেই আগুন ধরে যেত মালের ফলকায়, রঙের গুদামে, এমনকি এঞ্জিন ঘরেও।

'তখন কি করতে।

'সবাই মিলে আগুনের সঙ্গে ধুদ্ধ করতাম, আগুন নেভাবার চেষ্টা করতাম'—

'আর যুদ্ধে হেরে গেলে।

'সবাইকে গিয়ে উঠতে হত লাইফ বোটে,' উদাসস্থুরে বড়া সাব বললেন—'আর আমাদের নিয়ে লাইফ বোট ভেসে চলত সাগরে; কোন চলন্ত জাহাজের লোক আমাদের দেখতে পেলে উদ্ধার করত।

অপলা মুখার্জীর মনে খটকা লাগল। এতবড় জাহাজে যদি জীবন বাঁচানো সম্ভব না হয়, তা হলে ছোট্ট লাইফ বোটে বসে উদ্ধার না পাওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকা সম্ভব? কিন্তু সেই সন্দেহের কথা প্রকাশ না করে অপলা দেবী শুধোন—'লাইফ বোটে আমরা কি খেতে পেতাম?'

ঠিক এই মুহূর্তে এই প্রশ্ন হর্ষ চৌধুরীও করে বসেছে ডেক সারেঙকে। ক্রু ক্যাবিনে। সারেঙ জবাব দিচ্ছে 'কি আর খাবে—লাইফ বোটে তো আর চাল ডাল মাছ মাংস থাকে না। রান্নার বালাই নেই। ভাণ্ডারীদের ছুটি।

'তা হলে না খেয়ে থাকতে হয় বুঝি ?

'না খেয়ে থাকবে কেন,' মিট মিট করে হাসতে হাসতে সারেঙ বলে মাথাপিছু তিন লিটার জল, ৪৫৩ গ্রাম বিস্কুট, ৪৫৩ গ্রাম কৌটা দুধ ইত্যাদি লাইফ বোটে তো সব সময় জমা থাকে।'

'দৈনিকের জন্য ?'

'পাগল, তা কি হয়,—যতদিন উদ্ধার না পাওয়া যায়, ততদিন ওতেই চালিয়ে নিতে হয়।'

হর্ষ চৌধুরী আর প্রশ্ন করতে সাহস পায় না। বেচারা বড়ই ভাবনায় পড়ে যায়। তার মুখ দিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

সারেঙ তখন বলে এবার গিয়ে শুয়ে পড় তো বাপু !

আগুন নেভানোর পালা তখন চুকে গেছে। কিন্তু ডলফিনরা কি করে জেনেছিল রাজহংস জাহাজে আগুন লাগার কথা ? ওরা যে আমাদের সঙ্গে সাথে এগিয়ে চলছে। একদল ডলফিন যাচ্ছে জাহাজের আগে আগে, ঠিক পাইলটের মতো পথ দেখিয়ে। সমুদ্রে ওরা মানুষের পরম বন্ধু আমাদের বিপদ হলে ওরা ঠিক বুঝতে পারে। সাহায্যও করে।

ডলফিন দেখতে প্রায় হাঙরের মতো মস্তবড় একটি মাথা, সুন্দর মৎস্য পুচ্ছ, মাগুর মাছের মতো গায়ের রং। ওদের মাথায় দারুণ বুদ্ধি, মানুষের চেয়েও নাকি বেসি। সমুদ্রে টোপ গেঁথে বড়শী ফ্যালো বড় বড় মাছ কিংবা হাঙর এসে কপাত করে গিলে ফেলবে ডলফিন বড়শীর ধারে কাছে যাবেই না। ওরা বেশ বুঝতে পারে, ওটা টোপ। মরণের ফাঁদ। মানুষ অবশ্য কখনও ডলফিন মারে না।

জাহাজের সামনে ডলফিনদের লাফিয়ে চলতে দেখে অপলা মুখার্জী তো অবাক। মানুষ ঘণ্টায় তিন মাইল হাঁটে, আর ডলফিন গুলো যে চলছে জাহাজের আগে, পনেরো মাইলেরও বেশি বেগে ! কিন্তু ওঙ্গার চিন্তা ভাবনা অন্য রকম, ওঙ্গা ভাবছে, জাহাজের আগে সাঁতার কাটতে গিয়ে যদি ওরা তলায় চাপা পড়ে কিংবা প্রপেলারের

কাছে গেলে কাটা পড়ে ? তা কখনও হয় না। প্রাণ বাঁচাবার কায়দা ওরা জানে !

ডলফিন নিয়ে অনেক মজার মজার গল্প আছে ; কিছুদিন আগেই আমরা একটা মজার গল্প পড়েছি। অস্ট্রেলিয়ায় শুধু বাচ্চাদের জন্য একটি সী-বীচ আছে। সেখানে থাকে খুব বড় বড় দুটি ডলফিন। ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দিব্যি তারা খেলা করে রোজ দুটো বাচ্চাকে পিঠে চড়িয়ে ডলফিন দুটো মধ্যসাগরে নিয়ে যায়, অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ায় ; কখনও কিন্তু ডুব দেয় না—জলের তলে মানুষ যে শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যায় সে কথা ওরা ঠিক জানে !

ডলফিন যে মানুষের পক্ষে কত উপকারী তার প্রমাণ আমরা সম্প্রতি পেয়েছি টেলিভিশনে ছবি দেখে। আফ্রিকায় দুর্ভিক্ষ চলছে। আটলান্টিকের তীরে এক গণ্ড গ্রামের জেলেরা না খেয়ে মরছে, কারণ সমুদ্রে কোন মাছ ধরা পড়ছে না আগের মতো মাছ পেলে খেয়ে বাঁচতে পারত, বেঁচে পয়সা করতে পারত। একটা জেলের সঙ্গে এক ডলফিনের ছিল বন্ধুতা লোকটির না খেয়ে থাকার কথা ডলফিন বন্ধু কি করে যেন টের পেয়েছিল। টুক করে সে আটলান্টিকের জলে ডুব দিল, কিছুক্ষণ পর উঠে এলো মানুষটার সামনে মুখে তার মস্তবড় একটি মাছ। মাছটাকে সে মানুষ বন্ধুর দিকে ছুঁড়ে দিল। কথাটা সারা জেলে পল্লীতে জানাজানি হতেই সবাই এসে ভিড় করে বসে পড়ল সাগরের ধারে। ঘণ্টা কয়েক পর দেখা গেল, কয়েকশ ডলফিন এসে হাজির হয়েছে সবার মুখেই বড় একটি মাছ। শুধু কি তাই, ডলফিনগুলো মাছের ঝাঁকও তাড়িয়ে তাড়িয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে চারদিকে ঘিরে রয়েছে বলে মাছেরা পালাবার পথ পাচ্ছে না ; জলের উপর কেবলই লাফাচ্ছে। ছেলেরা তখন তাড়াতাড়ি জাল এনে মাছগুলোকে ধরে ফেলল। এমনি করে ডলফিনেরা মাছের ব্যবস্থা দিন কতক করে দিলে জেলেদের অবস্থা ফিরল, পেট ভরে খাবার পেয়ে চেহারা ফিরল।

ডলফিনের ধারে কাছে হাঙর আসে না। ভয় পায়! কিন্তু পরদিন রাতের বেলায় জাহাজের কাছে কিন্তু আমরা হাঙর দেখলাম।

রাতের আঁধারে তখন ডলফিনেরা দূরে সরে গিয়েছিল। অনেক জলের তলে। জাহাজ তখন ঘণ্টা দশেকের জন্য থামিয়ে দেওয়া হয়েছে, পিস্টন রিংর একটা জরুরি কাজ করে নিতে। আর জাহাজের পেছনে গিয়ে অনেকেই তখন মাছ ধরতে শুরু করে দিয়েছে। তা কায়দা কৌশল সবাই জানে বটে। জাহাজের গা বেয়ে বেশ বড় একটা ঝাড় লণ্ঠন নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রায় জলের ধারে অনেকগুলো বাল্‌ব জ্বলছে ঝাড় লণ্ঠনে, অনেকটা জায়গা জুড়ে জল আলো করে ফেলেছে। দুনিয়ার চিংড়ি মাছ এসে ভিড় করেছে সার্ডিন মাছের ঝাক দেখা যাচ্ছে। আর রিবন মাছ সূতানলী সাপের মতো জল সাঁতরে চলছে মাথা না দেখলে তো বোঝাই যেতো না মাছ বলে। মাছের বড় বড় টুকরো গেঁথে সবাই বড় বড় বড়শী ফেলেছে। এতো সব ছোট মাছ কি আর তাতে ধরে। অথচ সবার মনে কত আশা বড় বড় মাছ ধরবে, ভাজবে ভাজা মাছ খেয়েই পেট ভরে নেবে। কড়া-ভাজা মাছ আর গরম গরম চা কিংবা কফি। কিংবা কোক/রেলিং ধরে খুব ঝুঁকে রামজী ভীমজী বড়শীর সূতো গুটিয়ে তুলছিল/গুজরাতী ছেলে মাছ ধরা আর মাছ খাওয়ার বড় ওস্তাদ। এতক্ষণ মুখে তার কথা ছিল না যেন মাছ না ধরতে পারলে আর কথাই বলবে না! হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রামজী লাবিস্টার, লাবিস্টার অর্থাৎ লবস্টার। মানে গলদা চিংড়ি। গম্ভীর রামজী ভীষণ উত্তেজনার মধ্যে মুখ আর চেপে রাখতে পারে নি। গলদা চিংড়ি তখন অনেকটা উঠে গেছে আর চার পাঁচ ফুট এলেই, ব্যস। ভাণ্ডারী আসগর আলীরও আনন্দ আর ধরে না সে বলেই ফেলেছে সবটা লাবিস্টার ফরাই করে ফেলবে লসুন, আদা, জিরে, আর লঙ্কা মিশিয়ে। ঐ যা! রামজী হঠাৎ বলে উঠল গলদা চিংড়িটা তখন লাফ দিয়ে জলে পড়ে গেছে তারপর ল্যাজের ছাট মেরে হাওয়া।

সবার মন খারাপ হয়ে গেল। হবে না? দুফুট লম্বা লবিস্টার — সেই অনুপাতে মোটা। ওজন করে তিন কেজি। সমুদ্র ছাড়া এতবড় গলদাচিংড়ি কেউ কোথাও দেখেছে, না খেয়েছে।

ভিড় তখন খুব জমজমাট। টোপ গাঁথা সূতোয় বাঁধা অনেক বড়শী

তখন জলে ছাড়া হয়েছে। অথচ একটা মাছও কেউ ধরতে পারে নি। তবু তখনও সবার মনে অনেক আশা। ইকবাল ছোড়াটা হঠাৎ এবার চিৎকার করে বলছে—মুসা মাচ্ছি। মুসা মাচ্ছি! অর্থাৎ হাঙর এসেছে। হাঙরকে ইকবালরা মুসা মাছই বলে। কখনও বলে বদমাস মাচ্ছি।

হাঙরটা আবার বেহদ্দ শয়তান—সুখের শরীর জলে ভাসিয়ে টহল দিচ্ছে। একটু করে ল্যাজ নেড়ে সাঁতার কাটছে। বড় বড় মাছের টুকরো গেঁথে আরও চার পাঁচটা বড়শী জলে ফেলা হল! হাঙরটা সবগুলো একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল, তারপর রামজী ভীমজীর বড়শীটি মুখে নিয়ে বন্ধ করল। সবাই মিলে সে কি হাত তালি দেওয়া—যেন ম্যাজিকের খুব বড় খেলা দেখানো হল। রামজী অনেকটা সূতো ছেড়ে দিল; হাঙরটাও টোপ মুখে চলে গেল অনেক দূর। সবাই খুব খুশি—বাছাধন না উঠেই যায় না। রামজী এবার সূতো গুটিয়ে আনতে লাগল; হাঙরটাও কিনা সূতোর টানে জাহাজের ধারে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল—যেন ছুটে পালাবার কোন ইচ্ছা তার নেই! ওঙ্গা আমার কাঁধে শক্ত হাতে ধরে চোখ বুলিয়ে হাঙরটাকে দেখে নিল—সবার মতো ওঙ্গাও তখন ভাবছে, ওটা জাহাজের ডেকে উঠে এলে একটা হৈ হৈ ব্যাপার ঘটবে। একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। না ঘটেই যায় না!

চিফস্টুয়ার্ড ভিক্টর ব্র্যাগাঞ্জার মাছ ধরায় বড় সখ। সম্পূর্ণ তৈরী হয়েই এসেছিল—পরনে ছিল হাফ প্যাণ্ট, হাফ শার্ট, পায়ে জুতো নেই। মাছ ধরতে এলে কি আর বাবু সাজলে চলে। রামজীর টোপ হাঙরে গিলতেই ব্র্যাগাঞ্জ মনে মনে পণ করেছিল, আজ হাঙর না ধরে সে ছাড়বে না। ওদিকে চিফকুক ডিসিলভার কানেও রামজীর টোপ গেলার খবর চলে গিয়েছিল। এবার সে প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে চিফস্টুয়াডকে বলল—মো-রী মট্রিয়াল আহা? হাঙারটা কি খুব বড়? অন্য গোয়াবাসীদের মতো হাঙর খেতে কি বড় ভালবাসে—হাঙরের ঝোল আর ভাত। হঠাৎ চিফকুকের চোখ পড়ল আমার কোলে ওঙ্গার

দিকে। টুক করে সরে গেল অন্য দিকে—যেন খুব লজ্জা পেয়েছে!

রামজী ভীমজী এবার হাঙরটাকে টেনে তোলার কথাই ভাবছিল—কিন্তু বদমাস মাছটা টোপ-গাঁথা বড়শী হঠাৎ মুখ থেকে বের করে দিয়ে ল্যাজ তুলে সাঁতার কাটতে লাগল। কি তাজ্জব ব্যাপার—এমনটি আগে কেউ কখনও ছাখে নি। শোনেও নি।

এবার কিন্তু হাঙরটা চিফস্টুয়ার্ডের টোপ সত্যি গিলে ফেলল। তার টোপ গেলার একটা আলাদা ধরন ছিল এতক্ষণ যেন অন্যের টোপ একটু করে চোখে দেখছিল। কৌতুকচ্ছলে! এবার গেলার পালা। এখন সব চাইতে বেশি আনন্দ দেখা যাচ্ছে চিফ কুকের—ভালয় ভালয় হাঙরটা উঠে এলে চিফস্টুয়ার্ডের ইজ্জৎ বাড়বে; তার নিজের ইজ্জৎ বাড়বে—এমনকি সমস্ত গোমন্তক গোয়াবাসীদের ইজ্জৎ বেড়ে যাবে! চিফস্টুয়ার্ড; চিফ কুক দুজনই যে গোয়াবাসী।

কিন্তু হাঙরটা মহা বদমাস—আগের মতই মুখ থেকে টোপ বের করে দিয়ে জলে আলগোচে সাঁতার কাটতে লাগল—মনে হল, চোখ উঠিয়ে সবাইকে যেন দেখছে আর হাসছে, আর বলছে—রগড়টা দেখছ কেমন! এখানেই কিন্তু শেষ নয়, আরও বার আটেক সেয়ানা মুসাটা সবাইকে এমনি করে নাকাল করল।

চার সাব একটু হাওয়া খেতে এঞ্জিনরুম থেকে উপরে উঠে এসে দেখতে পেল, মুসা মাছটা খুব বড়ই বটে—সবাইকে বোকা বানিয়ে দিয়ে তখনও একটু করে সে সাঁতার কাটছে। বেশ ছন্দে ছন্দে। কি ভেবে চার সাব হাঙরের গায়ে পোড়া সিগারেট ছুঁড়ে দিয়ে বলল—ওর মরণ ঘনিয়ে এসেছে।

ঠিক তখন চিফ আফিসার এসে নতুন বুদ্ধি বাৎলে দিয়ে বললেন—মাল-তোলা শ্লিং (লোহার তার নাইলন সুতো মেশানো জাল) এনে নামিয়ে দাও জলে—তার চার ধারের রশি ধরে থাকো চারজনে; টোপ মুখে জালের উপর সাঁতার কাটছে কি ব্যস—সুতোয় মারো ঝটকা টান,

তারপর জালের রশি হাবিজ কর (অর্থাৎ উপরে টেনে তোল)। সবাই একবাক্যে স্বীকার করল, বদমাসটাকে ধরে উপরে তোলার জন্য এর চাইতে ভাল বুদ্ধি আর হতেই পারে না।

এবার হাঙর রামজী ভীমজীর টোপ গিলেছে। জালেও আটকে গেছে ; জাল প্রায় উঠে এসেছে। কিন্তু হঠাৎ ঝটকা মেরে হাঙরটা আবার নেমে গেল জলে। গলায় তখন বড়শী গেঁথে গেছে। দেহ জড়িয়ে পড়েছে জালে। আর কি সুযোগ ছাড়া যায়? সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল কাজ। মজিদ ট্যাণ্ডেল এগিয়ে গিয়ে বলল—হাবিজ! মারো টান হেইও সাবাস জোয়ান—হেইও; আরও জোরে—হেইও! আর যায় কোথা—হাঙর মশাই এবার ডেকের পরে কাত হয়ে পড়ে আছে ; বিরাট বাঘা-হাঙর। গা-মাথায় ডোরা ডোরা দাগ। মিণ্টু মৈত্র বললেন—টাইগার শার্ক।

হাঙরটাকে নিচে নিয়ে গিয়ে ওজন করে দেখা গেছে পঁয়ত্রিশ কিলো। কালকে কি করে ছাল ছাড়িয়ে রান্না হবে তার জল্পনা চলছে। ওঙ্গাকে বললাম—হাঙর খাবে? ওঙ্গা বলল—ধুর!

হর্ষ চৌধুরী প্রথমে ভেবেছিল হাঙর খাওয়ার কথাটা বোধ হয় তামাসার ব্যাপার। গুজরাট, গোয়া, মাদ্রাজের লোকদের উৎসাহ দেখে এবার তার বিশ্বাস জন্মেছে। আমি বললাম—খাবে তুমি হাঙর?

হর্ষ বলল—কেন নয়!

॥ ১৮ ॥

ভূমধ্যসাগরের শেষ তিনদিনে রাজহংস যখন পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলেছিল, তখন হাওয়ার বেগ ছিল কম, সমুদ্র ছিল শান্ত। খুব বড় একটি যাত্রীবাহী জাহাজ আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। সারাটা ডেক তার আলোয় আলোময়। ওটা যাচ্ছিল ইটালীর দিকে। ওঙ্গাকে বললাম—ঐ দ্যাখো একটা শহর জলের উপর ভেসে চলেছে।

ওঙ্গার জবাব যেন তৈরীই ছিল; বলল—নান্ না—ওটা তো জাহাজ!

শহর যে সমুদ্রে ভেসে চলে না, জাহাজ যে জাহাজই, সে বুদ্ধি ওঙ্গার হয়েছে। সম্প্রতি ওর মা আবার সজাগ হয়ে পড়েছেন জাহাজের হরেক রকম আলো নিয়ে—বিশেষ করে চলতি জাহাজে অন্তত চারটি আলো যে দেখাই যায়। সে সম্বন্ধে জ্ঞান তার এখন মোটামুটি পাকা।

সামনের মাস্তুলের উপরে সামনের দিকে সাদা আলো দেখে অপলা দেবী প্রশ্ন করেন-ওটা ওখানে কেন?

আমাকে ব্যাখ্যা করে বলতে হয়—ওটাকে বলে মাস্টহেড লাইট। সামনের জাহাজ কম করে ছ মাইল দূর থেকে ঐ আলো দেখলেই বুঝবে, আমরা এগোচ্ছি—সতর্ক হয়ে জাহাজ চালাবে। যাতে আমাদের ঘাড়ের উপর এসে না পড়ে।

আমাদের জাহাজের পেছনেও তো একটা সাদা আলো আছে—

'হ্যাঁ। পেছন থেকে জাহাজ এলে তিন মাইল দূর থেকে দেখতে পাবে এই আলো। সাবধান হতে পারবে।'

'আমরা ক মাইল দূরে আছি ওরা কি করে বুঝবে?'

'খুব সোজা—রেডার চালিয়ে।'

আমাদের বাঁয়ে লাল আলো, ডাইনে সবুজ আলোও তো রয়েছে—

শুধু আমাদের কেন। পৃথিবীর সব চলন্ত জাহাজেই। বাঁয়ে লাল, ডাইনে সবুজ আলো চলন্ত জাহাজে দেখলে বুঝতে আর কষ্ট হয় না, দুটো জাহাজ এগিয়ে আসছে সামনে থেকে; যাচ্ছে আমাদের উল্টো দিকে। সামনে লাল বা সবুজ আলো দেখলে? একটা জাহাজ আড়াআড়ি এগিয়ে চলেছে, আমাদের বাঁয়ে, কিংবা ডাইনে। সোজা হিসাব।

অবশ্য সমুদ্রে অত নির্ভয়ে কি আর জাহাজ চালানো যায়, নাকি সবাই আমাদের জন্য নিরাপদ পথ ছেড়ে দেয়। চলতি পথের নিয়ম কানুন জানতে হয় ঠিকই, কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা উপস্থিত বুদ্ধিটি প্রখর হওয়া চাই। বিপদে তা হলে কমই পড়তে হয়।

এ যুগের জাহাজ চলে কলের জোরে, পনেরো ষোল মাইল বেগে। যাত্রীবাহী জাহাজের বেগ অবশ্য অনেক বেশি। বছর কয়েক আগে একটি দুর্ঘটনা ঘটল, পৃথিবীতে তেলের অভাব দেখা দিল, দামও গেল বেড়ে। সবার তখন দারুণ ভাবনা হল—এবার কি তবে পাল খাটিয়ে জাহাজ চালাতে হবে! তেলের কি আর কম খরচ? রাজ-হংসর কথাই ধরা যাক, পাঁচশ ফুট লম্বা, বারো হাজার টনের মতো মাল বইতে পারে– তেল খরচ রোজ তিরিশ টন অর্থাৎ দুহাজার টাকা টন হিসেবে ষাট হাজার টাকা। এছাড়া আড়াই টন ডিজেল তেলও লাগে অর্থাৎ আরও দশ হাজার টাকা। ঘাটে বাঁধা থাকলে তেল খরচ অবশ্য খুব কম, সব মিলে আড়াই টন, তাই রক্ষে!

ভূমধ্যসাগরে আমরা খুব বড় একটি কাঠের জাহাজ দেখতে পেয়েছি, পাল খাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ফ্রান্সের দিকে। আগে পিছে তার অনেক গুলো পাল। বেলা তখন সাড়ে বারোটা—আমাদের ডাইনে স্পেনের উপকূল ছিল তিরিশ মাইল দূরে, বাঁয়ে আলজেরিয়া চল্লিশ মাইল। অর্থাৎ ডাইনে ইউরোপ, বাঁয়ে আফ্রিকা মহাদেশ রেখে আমরা এগিয়ে চলেছিলাম।

আরও একটি ছোট্ট নৌকো ছিল আমাদের কাছাকাছি। সাদা রঙের বেশ ছিমছাম ছিপ নৌকো। তাতে একটি মাত্র লোক, পাল খাটিয়ে এগিয়ে চলেছে। এতবড় জাহাজে আমরা এতো লোক দাঁড়িয়ে যে তাকে দেখছি ভ্রূক্ষেপ নেই। এই লোকগুলোর ধরণ আলাদা। ছেলেবেলায় কবিতায় আমরা পড়েছি, কলম্বাসের মতো আমরা পৌঁছে যাব নতুন দেশ। আজ আর পৃথিবীতে কোন নতুন দেশ নেই। সুতরাং আবিষ্কার করারও উপায় নেই। তবু ঐ লোকগুলো বোধ হয় মনে মনে সেই কবিতা আওড়ায়, আর নৌকা নিয়ে সাগরে বেরিয়ে পড়ে। একা একা। সমুদ্র ওদের নেশা ধরায়।

আর একটি লোকের কথা বলছি— ইংলণ্ডের প্লিমাউথ থেকে রওনা দিলেন, নাম তার ফ্রান্সিস চিচেস্টার। ঝানু নাবিক। বয়স ষাট। তার মোটর বোটের নাম জিপসি মথ। আটলান্টিক দিয়ে এগিয়ে

উত্তমাশা ঘুরে চিচেস্টার গোটা ভারত মহাসাগর পাড়ি দিলেন। তারপর প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে এগিয়ে উঠলেন গিয়ে অষ্ট্রেলিয়ার সিডনীতে। পনেরো হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে। স্রেফ একা। ঐ যে, একই স্বপ্ন—সমুদ্রকে জয় করার স্বপ্ন।

চিচেস্টার তো গিয়েছিলেন মোটর বোটে। ১৯৬৬ সালে। তাঁর প্রায় একশ নব্বই বছর আগে ক্যাপটেন কুকও একই জায়গা থেকে রওনা হয়ে একই পথে এগিয়েছিলেন, আরও দুহাজার মাইল বেশি এগিয়ে গিয়েছিলেন, স্রেফ পাল খাটানো জাহাজ নিয়ে। কুক এক দুর্জয় সমুদ্রচারী!

আমরা লাঞ্চ খেতে খেতে এইসব কথা আলোচনা করছিলাম। খাবার আয়োজনটি মন্দ ছিল না—স্যালাড, পাঁপড়ভাজা, মুরগী বিরিয়ানি, আলুকপির ডালনা, দৈ, কমলালেবু। বেশির ভাগ জেড্ডায় নেওয়া রসদ। কিন্তু কিছুই আরবের মাল নয়—কমলালেবু আমেরিকার, বাঁধা কপি স্পেনের, মুরগী নিউজিল্যাণ্ডের, দৈ অষ্ট্রোলিয়ার দুধে তৈরী। আরবে সব আমদানী করা। অর্থাৎ ভূমধ্যসাগরের জলে আমাদের জাহাজে বসে ভারতের চালডাল, নিউজিল্যাণ্ডের মাংস, স্পেনের তরিতরকারি, অষ্ট্রেলিয়ার দৈ, আমেরিকার কমলালেবু খেলাম। নইলে আর আমরা জাহাজী কেন!

খেতে খেতে আমরা টেলিভিশন দেখছিলাম। স্পেনের কোন শহর থেকে ছবি আসছিল। তখন ষাঁড়ের লড়াই চলছে। স্পেনের খুব নামকরা - এ যেন আমাদের ফুটবলের নাম। খুব তাগড়া একটি ষাঁড়; তার মুখোমুখি সাধারণ একটি লোক। এক টুকরো লাল শালু লোকটি ভেংচি কেটে ষাঁড়ের সামনে তুলে ধরছে, ষাঁড়টা আসছে ধেয়ে। লোকটি কিন্তু বেশ কায়দা করে লাল কাপড়টা ডাইনে বাঁয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। বার বার। ষাঁড়টির হয়রাণির শেষ থাকছে না। এই তো ব্যাপার। লোকে দামি টিকেট কেটে ষাঁড়ের লড়াই দেখছে। আমরা কিন্তু স্পেনে না গিয়েই দেখলাম। জাহাজে বসে!

এবার আমরা জিব্রালটার পেরিয়ে যাচ্ছি—এবার ডাইনে মাত্র

পাঁচমাইল দূরে ইউরোপ মহাদেশ, বাঁয়ে ন'মাইল দূরে আফ্রিকা মহাদেশ দেখছি। জিব্রালটার বন্দরের ঘরবাড়ি দালান কোঠাও চোখে পড়ছে। পাহাড়ের মাথায়। কে জানে ঐখানে বসে জিব্রালটারীরা চলন্ত জাহাজীদের হাতছানি দিয়ে ডাকে কিনা!

জিব্রালটারের সাগরতীরে বড় একটি পাথর পড়ে আছে; তাকে বলে জিবাল-উট-তারিক, অর্থাৎ তারিকের পাথর। এর একটি ইতিহাস আছে। সে প্রায় সাড়ে তেরশ বছর আগের কথা। কয়েক বছর আগে হজরত মহম্মদের মৃত্যু হয়েছে। আরবরা বেরিয়েছে দেশ জয় করতে। সমস্ত উত্তর আফ্রিকা জয় করে সেনাপতি তারিক দাঁড়ালেন বর্তমান জিব্রালটারের উল্টোদিকে—সামনে তার চৌদ্দ মাইল চওড়া খাল (প্রণালী)! খাল পেরিয়ে সৈন্য সামন্ত নিয়ে তারিক ঢুকে পড়লেন স্পেনে, স্পেন জয় করলেন। পাথরটিকে তখন থেকে বলা হল জিবাল-উট তারিক বা তারিকের পাথর। জিব্রালটার এসেছে জিবাল-তারিক থেকেই।

একটি জিনিস আমরা লক্ষ্য করলাম--স্পেনে টেলিভিশন প্রায় সারাদিনই চালু থাকে এবং তাতে খেলাধূলা জাতীয় কিছু-না-কিছু চলছেই—ষাঁড়ের লড়াই, মোটর রেস, মোটর সাইকেল দৌড়, ফুটবল খেলা। কিংবা ডিস্কোনাচের আসর। স্পেনদেশ দেখার ইচ্ছা আমাদের অনেকেরই ছিল, কিন্তু উপায় ছিল না। স্পেনে তো আর আমাদের জাহাজ যাচ্ছে না।

জিব্রালটার দেখিয়ে ওঙ্গাকে বলা হল—ঐ ছ্যাখো কলকাতায় এসে গেছি।

ওঙ্গা বলল—ধূর, ওতো জিব্রালটার!

আমাদের চলার পথে কোথায় কোন্ শহর পড়ে। কোন্ সাগরে আমরা চলি ওঙ্গা রোজ ওর বাবার কাছে তা জেনে নেয়। এমন করলে কেউ ঠকাতে পারে!

॥ ১৯ ॥

এবার আমরা আটলান্টিক মহাসাগরে। ভাবতেও ভাল লাগছে। আমি তো আগেই আটলান্টিক দেখেছি। তবুও। যারা নতুন দেখছে তাদের তো কথাই নেই। অথচ সব সাগরের চেহারা একই—সেই সীমাহীন জলরাজ্য। একুল নেই, ওকুল নেই। তবু আটলান্টিকে এলে সবাই যেন নতুন কিছু খুঁজে পায়; সমুদ্র সম্বন্ধে নতুন চিন্তা মাথায় খেলে। মনে হয়। যেন এতদিন ছিলাম ছোট সাগরে—এইবার সত্যি সত্যি সমুদ্রে এসে পড়েছি। বড় সাগরে।

আটলান্টিকের চেহারা ইংরেজী S অক্ষরের মতো; দুটো তার অংশ, উত্তর আটলান্টিক আর দক্ষিণ আটলান্টিক। শীতকালে উত্তর আটলান্টিক ভয়ঙ্কর সাগর—ঝড়, বৃষ্টি, তুফানের তখন বড়ই দাপট। ইয়া বড় বড় ঢেউ তখন জাহাজ ডিঙিয়ে এপাশ থেকে ওপাশে গিয়ে পড়ে। শীতের আটলান্টিকে কেউ তাই আসতে চায় না—নাবিকরাও না। নাবিকদের তো কাজ করে খেতে হয়। জাহাজ সব সময় দোল খেলে, একাত-ওকাত হলে কাজকর্ম করা যায়, নাকি শান্তিতে থাকা যায়?

আমরা যেখানটিতে এসে পড়েছি উত্তর আটলান্টিক সেখানে সবে শুরু। ভাগ্যিস এখন শীতকাল নয়। আটলান্টিক মহাসাগর এখন মোটামুটি শান্ত। আমাদের বঙ্গোপসাগরে এর উল্টোটা-গরম কালে তার যতো গর্জন। ঘন বর্ষণের মৌসুমী দিনে বঙ্গোপসাগর কাউকে খাতির করে না—বড় বড় জাহাজগুলোকে তুলে আছাড় মারে। নাকানি চুবানি খাইয়ে ছাড়ে।

এইখানটায় আটলান্টিকের জলের রং তেমন মধুর নয়; কেমন যেন ছাই-ছাই। কোথাও আবার এক টুকরো নীল চাদরের মতো। আকাশময় রোদে ভরে আছে—দিনের চেহারা বেশ ফটফটে। তবে

যেন কেমন গম্ভীর। আটলান্টিক-গম্ভীর। অথচ আমরা মধ্য আটলান্টিক পাড়ি দিচ্ছি না—ডাইনে পর্তুগালের উপকূল দেখা যাচ্ছে চৌদ্দ মাইল দূরে। রাজধানী লিসবন থেকে টি-ভির ছবি আসছে।

পর্তুগাল হচ্ছে স্পেনের পশ্চিমে। স্পেনের একেবারে গা ঘেঁষে উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট দেশ —তার বাঁয়ের সীমানা পেরিয়ে যেতে আমাদের খুব বেশি সময় লাগল না। আবার আমরা স্পেনের উপকূলে এসে পড়লাম। তখনও আটলান্টিক মহাসাগর চলছে। এবার চারদিক ঘন কুয়াসায় ঢেকে আছে—তারই মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। সামনে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু যদি কোন জাহাজ থাকে, যদি তার সঙ্গে আমাদের টক্কর লাগে? ডুবে মরতে হবে? উ-হু, টক্কর যাতে না লাগে তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে- আমাদের জাহাজ থেকে লম্বা টানে জোর আওয়াজ তুলে বাঁশি বাজানো হচ্ছে। দু মিনিট পরপর। একে বলে ফগ সিগন্যাল। আমাদের সামনে কোন জাহাজ থাকলে সেখানেও এই বাঁশি বাজত। আমরা এতক্ষণ শুনতে পেতাম—শুনে সঙ্গে সঙ্গে কিছু ঘুরিয়ে জাহাজ চালাতাম, কিংবা অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হত। রেডার তো চলছেই—কতদূরে কোন্ দিকে কখনো জাহাজ রয়েছে তার ছবি তো রেডারে দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। তবু নিয়ম মতো বাঁশি বাজাও। সাবধানের মার নেই! এমনও তো হতে পারে, সামনের জাহাজে রেডার অচল। কিংবা পুরানো দিনের জাহাজ। রেডার নেই-ই। ফগ-সিগনাল বাজিয়ে তাদের তো জানিয়ে দিতে হবে যে আমরা এখানে রয়েছি। সাবধান!

মাত্র এক ঘণ্টা আগে সূর্য অস্ত গিয়েছে। আমাদের দেশে গরম কালে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত সূর্যের আলো থাকে। কিন্তু আমরা এখন অনেক উত্তরে সরে এসেছি। এখানে সূর্য ডোবে আরও পরে। আশ্চর্য, আটলান্টিকের আকাশে সপ্তর্ষি এবং ধ্রুবতারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

পৃথিবীটা আজব জায়গা—উত্তরে দক্ষিণে সূর্য ডোবে আগে পরে—

পূবে পশ্চিমে সময় বাড়ে কমে ! জাহাজে চলতে চলতে আমরা অক্ষরে অক্ষরে এর প্রমাণ দেখতে পাই।

এবার পরের দিন তুপুর বেলা। স্পেনের উপকূল কোথায় মিলিয়ে গেছে। রাজহংস এসে পড়েছে বে-অব-বিস্কেতে অর্থাৎ বিস্কে উপসাগরে —আমাদের যেমন বঙ্গোপসাগর। উপসাগর হিসেবে বিস্কের বড় বদনাম—সারাবছরই বিস্কে ঢেউ ভাঙে। ফোঁস ফোঁস করে। জাহাজে চিস্কে উপসাগর পা'ড় দেওয়া তাই কারও পছন্দ নয়—নাবিক, যাত্রী কারও নয়। অথচ উপায় নেই—ইংলণ্ড, জার্মানী, কিংবা নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশে যেতে হলে বিস্কে পাড়ি দিতেই হবে। সমুদ্রের অস্বস্তি ভুগতেই হবে। এবার বিস্কেতে আমি নিজে তো খুবই ভুগলাম— হাঁড়-কাপানো জ্বর আর প্রচণ্ড গা-হাত পা বেদনায়।

আমরা ইংলিশ চ্যানেলের মুখে এসে পড়েছি। রাত সোওয়া দশটা। আমাদের চারদিকে অনেক জাহাজ রয়েছে। বাঁয়ে ইংলণ্ডের উপকূল আলোয় আলোময়। মনে হচ্ছে যেন আলোকের উৎসব লেগে গেছে—হাজার দীপাবলীর উৎসব এক রাতে চলছে। এ ঠিক মুখে বলার নয়, লিখে বোঝাবার নয়— তুচোখ ভরে ছাখো, আলোর আশীর্বাদ নাও।

ইংলিশ চ্যানেলের আকাশটিও অদ্ভুৎ সুন্দর দেখাচ্ছে। কাল ছিল পূর্ণিমা। আজও আকাশে মস্ত একটি চাঁদ রয়েছে। ওদিকের আকাশের টুকরোগুলো রক্ষাকালীর গায়ের রঙের মতো দেখাচ্ছে। বাকি আকাশ হলুদ মাছের পিঠের মতো. ত্রিকোণ চতুষ্কোণ মেঘের টুকরোয় বুনট করা। এ এক আশ্চর্য আকাশ !

এবার ইংলিশ চ্যানেলের পাইলট স্পিড বোট হাঁকিয়েএসে জাহাজে উঠলেন - এ স্পিড বোট তো নয়, যেন পাইলটের পক্ষীরাজ ঘোড়াটি। এই ঘোড়ার গায়ে জোর আছে। মনে দেমাক আছে। চলনে স্টাইল আছে ; যেন গর্ব করে বলছে—এই ছাখো, যাকে-তাকে নয়। ইংলিশ চ্যানেলের পাইলট নিয়ে আমি চলি।

আমাদের লণ্ডন-এজেন্ট পাইলটের হাত দিয়ে কিছু সওগাত পাঠিয়েছে—চিঠিপত্রের প্যাকেট, এদেশী পত্রিকা, উত্তর সাগরের চার্ট। সবই বড় দরকারি জিনিস। জাহাজী লোকের চিঠি আগেই এজেন্ট আপিসে এসে গিয়েছিল। আমাদের যেতে হবে লণ্ডনে। কিন্তু লণ্ডন আরও অনেক দূরে। এজেন্ট তাই চিঠিগুলো পাঠিয়ে দিয়েছে।

ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়র্ল্যাণ্ড নিয়ে বৃটেন। বৃটেন আগে ছিল ইউরোপের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু হঠাৎ একদিন ইউরোপ থেকে দূরে সরে পড়ল। প্রায় আড়াইশ মাইল দূরে। সে কি আজ? সাত হাজার বছর আগে। হয়তো খুব বড় রকম ভূমিকম্পের ফলে।

নামেই চ্যানেল ইংলিশ চ্যানেল কিন্তু খুব ছোট নয়—লম্বায় সাড়ে তিনশ, পাশে সোয়াশ মাইল। জলের রং সবুজ। বলতে গেলে সারা বছরই ঢেউ দেয়। গর্জন করে। লোকের সবচেয়ে বেশি সাগর পীড়া হয় এইখানে। কুয়াসাও এখানে খুব—ফলে পৃথিবীর সব চাইতে বেশি দুর্ঘটনা এইখানে ঘটে। সারা পৃথিবীর অর্দ্ধেক জাহাজ দুর্ঘটনা। জাহাজের সংখ্যাও তো এখানে খুব। বছরে তিন লাখ জাহাজ চ্যানেল দিয়ে যাতায়াত করে। পশ্চিম ইউরোপের হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মানী ইত্যাদি দেশের জাহাজ বের হবার আর পথই বা কোথায়?

ইংলিশ চ্যানেলে অনেক যুদ্ধ হয়েছে। নৌযুদ্ধ। ১৫৮৮ সালের কথা—ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ করতে স্পেন থেকে অনেক যুদ্ধ জাহাজ এলো, নাম তার স্প্যানীস আর্মাডা। কারণ ইংলণ্ডের জলদস্যুরা স্পেনের অনেক জাহাজ থেকে অনেক টাকা পয়সা সোনাদানা লুটে নিয়েছিল। কিন্তু ইংলিশ চ্যানেলের যুদ্ধে স্পেনের হার হল।

চ্যানেলের জল বরফের মতো ঠাণ্ডা। তবু মানুষ এখানে সাঁতার কেটে ওপারে ফ্রান্সে গিয়ে ওঠে। সারা পৃথিবীর লোক এই নিয়ে প্রতিযোগিতা করে। দুইজন ভারতবাসী ইংলিশ চ্যানেলে সাঁতার কেটে বিখ্যাত হয়েছেন। একজন তার মহিলা—আরতি সাহা। অপরজন মিহির সেন। তৃতীয় ব্যক্তিও বাঙালী; বাংলাদেশের ব্রজেন দাশ।

পাইলট যে আমাদের জন্য পত্রিকা এনেছিলেন তা আগেই বলেছি —মেল, গার্ড়িয়ান, ডেইলি মির্‌র্ ইত্যাদি পত্রিকা। ইংলণ্ডের পত্রিকা পড়ে অনেকেই অবাক—প্রথম পাতায় চুরি ডাকাতি, খুন খরাবির খবর বেশ বড় করে ছাপা হয়েছে—পত্রিকাগুলো অপরাধীর ছবিও ছেপে দিয়েছে, এমনকি তাদের বিয়ের ছবি, ছেলে বৌয়ের ছবি আর খবর এমন করে ছেপেছে। যেন তারা সব বিখ্যাত লোক।

ডেইলি মিররে একটি খবর পড়ে আমরা খুব হাসলাম—এক ভদ্র-লোকের মানি ব্যাগ খোয়া গিয়েছিল ; তাতে ছিল পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড, ভারতীয় মুদ্রায় সোয়া পাঁচশ টাকার মতো। দিনকতক পর তিনি একটি আশ্চর্য চিঠি পেলেন—আর তাতে লেখা ছিল—'আপনার পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড আমাদের খুব কাজে লেগেছে— অনেকদিন পর প্রাণ ভরে আমরা খুব ভাল ভাল খাবার খেলাম। বাচ্চারা তো খুবই খুশি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই।' পত্রলেখকের নাম ঠিকানার বদলে শুধু মিঃ ফাইণ্ডার লেখা ছিল।

টাকা হারানো ভদ্রলোকও চিঠি পেয়ে খুব হেসেছিলেন। ভদ্র-লোক বলেছিলেন, 'পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড হারানো কোন ব্যাপারই নয়— ওরা সবাই যে একদিন ভাল খাওয়ার আনন্দ পেয়েছে তাতেই আমার আনন্দ হচ্ছে।' মিঃ ফাইণ্ডারের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা তার ছিল ; কিন্তু ঠিকানা তো আর তিনি দেন নি। মিঃ ফাইণ্ডার ভেবেছিলেন, ঠিকানা দিলে টাকা ফেরত চায় যদি !

আমাদের লণ্ডন যাওয়া হল না। হেড অফিসের টেলেক্সে আজ বলা হয়েছে তোমরা প্রথমে পশ্চিম জার্মানীর ব্রিমেন আর হ্যামবুর্গে যাও। এবং পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা কর !

॥ ২০ ॥

এবার আমরা উত্তর সাগরে এগিয়ে চলেছি। এ পর্যন্ত অনেক সাগর উপসাগর আমাদের পেরিয়ে আসতে হয়েছে—বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর, আরব সাগর, লোহিত সাগর, ভূমধ্যসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, বিস্কে উপসাগর। সব মিলে সাতটি। সপ্তসিন্ধু!

উত্তর সাগরে ফেরি স্টীমার চলছে ; গঙ্গায় যেমন চলে খেয়া নৌকো। ইউরোপের দেশ থেকে খেয়ায় বসে লোক আসছে ইংলণ্ডে—ইংলণ্ড থেকে এন্টোয়ার্প. রটারড্যাম, ব্রিমেন হামবুর্গ ইত্যাদি। শ তিনেক মাইলের পথ, চব্বিশ ঘন্টার সমুদ্র যাত্রা। ভাড়াও তেমন কিছু নয়। অথচ সমুদ্র ভ্রমণ হচ্ছে। নতুন দেশ দেখা হচ্ছে।

আগে উত্তর সাগর মাছের জন্য বিখ্যাত ছিল ; তার ডগার-ব্যাঙ্কে ছিল মাছের খনি। ইংলণ্ড, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশের শতখানেক মাছধরা জাহাজ দিনরাত উত্তর সাগরে মাছ ধরত —কড, হ্যাডক, হ্যালিব্যাট, টারবট, প্লেইস—কত রকমের মাছ। উত্তর সাগরে এখন আর মাছের জাহাজ দেখাই যায় না। সেখানে এখন তেলের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। এপার ওপারের সবগুলো দেশ এখন তেল তুলতে মেতে উঠেছে। মাছ ধরার চাইতে তাতে বেশি লাভ। পৃথিবীতে এখন যার হাতে তেল আছে তার কোন অভাব নেই।

উত্তর সাগর পাড়ি দিয়ে এবার আমরা একটি নদী মোহনায় এসে পৌঁছে গিয়েছি। ওয়েসার নদীর মোহনায়, গঙ্গার মোহনার শেষে স্যাণ্ড হেড্সের মতো। এবার পাইলট নিয়ে আমাদের ব্রিমেনে যেতে হবে। ব্রিমেন পশ্চিম জার্মানীর এক বড় বন্দর। যারা এই প্রথম জার্মানী দেখবে তারা বেজায় খুশি। আজ থেকে ছেচল্লিশ বছর আগে জার্মানী দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ সুরু করেছিল। তারপর সারা পৃথিবীতে কত ওলটপালট হয়ে গেছে! যুদ্ধ শেষে জার্মাণ গেছে হেরে, সারা

দেশ দু টুকরা হয়ে দুটো জার্মানী হয়েছে। পূব জার্মানী, পশ্চিম জার্মানী।

ব্রিমেন কলকাতার মতই নদী বন্দর; সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসে জাহাজ পাইলট নিয়ে ব্রিমেনের ঘাটে গিয়ে বাঁধে। ওয়েসার নদী বেয়ে। কিন্তু ওয়েসার গঙ্গার মতো নয়। গঙ্গার দৃশ্য শোভার সঙ্গে ওয়েসারের মিল কম। এমনকি এই নদীপথে চলতে ওঙ্গাকে পর্যন্ত ঠকানো যায় নি। 'এই দ্যাখো গঙ্গা নদী' বলতেই ওঙ্গা বলে—গঙ্গা হলে নারকেল গাছ কোথায়! কৃষ্ণচূড়া কোথায়!

এমন মেয়েকে নাকি ঠকানো যায়!

ওয়েসারের বাঁ তীরে প্রথমেই চোখে পড়ল বড় একটি বন্দর। ওরা বলে কনটেইনার পোর্ট। ওখানে জাহাজ ভেড়ে শুধু কনটেইনার তুলে নিতে। কিংবা নামিয়ে দিতে।

কনটেইনার হচ্ছে রেলওয়াগনের মতো মস্ত একটি সিন্দুক! কিংবা বলা যাক বাক্স। বাক্সগুলো আগেই মাল দিয়ে ভরাট করা থাকে—জাহাজ এসে শুধু তুলে নেয়,তারপর অন্য বন্দরে নিয়ে নামিয়ে দেয়, ব্যস সময় বাঁচে, অনেক ঝঞ্চাট বাঁচে। আমরা তো বন্দরে গিয়ে দুপাঁচদিন থাকি, দেশ দেখি, লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করি। কনটেইনারের লোক তা পারে না—কারণ জাহাজ বন্দরে আসার পর এক বেলাও থাকে না।

এবার ওয়েসার নদীপথে অনেকটা এগিয়েছি। ডানদিকে একটা কারখানা দেখা যাচ্ছে। এরোপ্লেন তৈরীর কারখানা। অনেকগুলো প্লেন তৈরী হয়ে ইয়ার্ডে পড়ে আছে। গোটা কয়েক উড়ছে—বোধ হয় ট্রায়াল দিতে। গঙ্গা বেয়ে এগোতে বাটানগরে আমরা জুতো তৈরীর কারখানা দেখি। নতুবা চটকল। কিংবা পাটকল। যদি বজবজ কিংবা ডায়মণ্ড হারবারে একটা এরোপ্লেন, নিদেন পক্ষে একটি মোটর গাড়ি তৈরীর কারখানা থাকত!

এবার বড় একটি তিনকোনা বাঁকে সুন্দর একটি মিনি-ডক দেখা যাচ্ছে। শত শত নৌকো সেই ডকের জলে ভিড়ে আছে। পালখাটানো

ছিমছাম ছোট নৌকো—সব একমাস্তুলওয়ালা। ছোট ছোট কিছু রঙীন পিনিসও রয়েছে। কিন্তু নৌকোগুলো দেখেই আমার মনে পড়ল ভূমধ্যসাগরের সেই একলা নাবিকের কথা, নীল সাগরে নাউ ভাসিয়ে যে এগিয়ে চলেছিল ; হয়তো বা নিরুদেশ যাত্রায়। সজাগ দৃষ্টি সামনে রেখে। তারই মতো পথ– ক্ষ্যাপা লোক এখানেও অনেক রয়েছে। ওয়েসার নদী বেয়ে তারা উত্তর সাগরে যায়, পাল খাটিয়ে ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়ায় ; তারপর একসময় ফিরে এসে তরী ভেড়ায় ওয়েসারের বাঁকে।

শুধু কি পশ্চিম জার্মানী ? ইউরোপের যে সব দেশে জল পথ আছে, তার সব জায়গাতেই এমন নৌকোবিহারীরা রয়েছে। আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া, জাপানেও রয়েছে। মোটর গাড়ি তো অনেকেরই থাকে ; কিন্তু এমন নৌকো থাকে কজনের ? তোমার নৌকো আছে তো সমাজে বাড়তি একটু খাতির আছে। পাঁচজনে বলবে—ছোঁড়াটা বেশ স্মার্ট।

ওয়েসারের ধার বরাবর পর পর বেঞ্চ পাতা রয়েছে। সুন্দর রঙ করা সব বেঞ্চ। গাঁয়ের লোক কুকুর হাতে হাঁটছে। বুড়ো-বুড়িরা হাঁ করে পাল-তোলা নৌকো দেখছে ; চলন্ত জাহাজ দেখে হাত নাড়ছে, এমনকি রুমাল উড়িয়ে জাহাজীদের বাই-বাই করছে। সমান করে কাটা ঘাসের গালিচা নদীর ধার পর্যন্ত এসে ঠেকেছে। ওক, ফার, সিডার গাছগুলো সটান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর গাছে সবুজের ছড়াছড়ি। মাঝে মাঝে দু চারখানা বাড়িও চোখে পড়ছে– লাল ইটের গাঁথুনি, সাদা রঙের পয়েন্টিং করা। জানালাগুলো কাঁচের, তার কাঠের ফ্রেম আবার সাদায় কালোয় রং করা। তর্ তর্ করে বয়ে চলা নদী, সবুজ ঘাস আর গাছপালা, লাল-সাদা-কালো রঙের বাড়ি ঘর দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল আমরা যেন সত্যি এক অচিন দেশে পৌঁছে গিয়েছি।

একটি কথা মন দিয়ে ভাবতে লাগলাম—ভাগ্যিস ওয়েসার নদীর

পার ভাঙে না। নদীপারের মানুষের কপাল ভাঙে না। এদের তো আর বাংলার মতো পলিমাটির দেশ নয়।

অদূর মাঠে ঘাস বোনা রয়েছে; গরু ভেড়া চরছে। এই দিকটায় শস্য বোনার তেমন রেওয়াজ নেই—গরু ঘোড়া আর ভেড়া পালনে নাকি লাভ বেশি। ফসলের মধ্যে শুধু আপেল আর আঙ্গুর। কথাগুলো বললেন আমাদের পাইলট। কাছেই তার বাড়ি, ফেগেসাক নামে এক ছোট গাঁয়ে। পাইলটের দুটো ছেলে আছে। তারা নৌকো নিয়ে ওয়েসারে ভাঁটি দিয়েছিল; একটু আগে হাত নেড়ে বাবাকে স্বাগত জানিয়েছে। ভদ্রলোক বেশ গর্বের সঙ্গে কথাগুলো বললেন। পাইলট ফেগেসাকে জন্মেছেন। ব্রিমেনে পড়েছেন; জাহাজে কাজ করতে করতে সারা পৃথিবী দেখে নিয়েছেন। ওয়েসারে পাইলট হয়েছেন অল্পদিন আগে।

এতদূর এগিয়ে এসেছি। ব্রিমেন বন্দর আর বেশি দূরে নয়। আশ্চর্য, এ পর্যন্ত কাউকে বঁড়শী ফেলে নদীর ধারে বসে থাকতে দেখি নি, কেনারা থেকে খ্যাব্‌লা জাল ফেলেও কেউ মাছ ধরে নি। মনে হচ্ছে নদীর জল বেশ টলটলে। স্রোত বইছে ধীরে সুতরাং দুর্বার তেজ নিয়ে ওয়েসার এগিয়ে চলছে না।

আমাদের মাথার উপর দিয়ে হেলিকপ্টার উড়ে সাথে সাথে চলছে জাহাজ থেকে পোড়া তেল, আবর্জনা ইত্যাদি নদীর জলে ফেলা হচ্ছে কিনা দেখছে। নদীর জল ওরা কিছুতেই দূষিত করতে দেয় না। জল দূষিত হলে লোকের স্বাস্থ্য খারাপ হবে, তাছাড়া পোড়া তেল, লোহার মরচে ধোয়া জল, কারখানার এ্যাসিড এসে নদীতে পড়লে মাছের মায়েরা আর ডিম ছাড়বে না—মাছও হবে না। আমাদের নদীর জলে যত্ন নেওয়া হয় না বলে মাছেরা সব উধাও হয়ে গেছে। এখানে জল দূষিত করতে ধরা পড়লে মোটা জরিমানা দিতে হয়—কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকা। এখানে, জাপানে, আমেরিকায় জলের উপর এমনি নজর রাখা হয়—জাহাজের মাথায় মাথায় এমনি করে হেলিকপ্টার চলে!

শেষ পর্যন্ত রাজহংস গিয়ে ব্রিমেনের ঘাটে বাঁধল। আমরা এই প্রথম জার্মান মাটির স্পর্শ পেলাম।

॥ ২১ ॥

সাগরে সমুদ্রে যখন জাহাজ চলে চারদিকে শুধু জল আর জল,—বলতে গেলে এক জলের রাজ্য বিরাজ করে। কিন্তু জলের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। কাজের ফাঁকে, কিংবা চলতে ফিরতে একটুখানি যা চোখে পড়ে ব্যাস। শুধু জল আর জলের মধ্যে দেখবার মতো কিইবা আছে। জাহাজ চোখে পড়লে বরং জানতে চেষ্টা করি আমাদের দেশের জাহাজ কিনা—আমাদের দেশের জাহাজ হলে মনটা ভাল লাগে, রাজ-কোম্পানীর জাহাজ হলে তো কথাই নেই—যেন আমাদের নিজেদের সম্পত্তি। এবং আপনার লোক রয়েছে সেই জাহাজে। আশ্চর্য মানুষের আপন-পর—জ্ঞান/হয়তো বসে আছি লণ্ডনে/পত্রিকা পড়ছি। ভারতের খবর চোখে পড়লে সেটা আগে পড়ি। বাংলার কোন কথা পেলে আরও মনোযোগ দেই। কিন্তু যদি কোন আশ্চর্য প্রসঙ্গে নিজের জেলা বা গ্রামে নাম চোখে পড়ে, মনটা তখন নিজের বাড়ির কথা শোনার আশা করে—বাড়ির আপন লোকদের কথা।

জেড্ডা ছাড়ার প্রায় পনেরো দিন পর ব্রিমেনে এসে মনটা বড় খুশি হল—আবার মাটিতে হাঁটব, ঘরবাড়ি দেখব, গাছের শোভা দেখব; মানুষ দেখব। অথচ ওরা জার্মান মানুষ, আমাদের ভাই-বোন-বন্ধু কেউই নয়—ওদের ভাষা আমরা জানি না, ওরাও আমাদের ভাষা বোঝে না। ওরা ডেকে আমাদের সঙ্গে কথা বলবে না, বাড়িতে যেতে বলবে না, খেতে বলবে না। তবু যেন এখন মনে হচ্ছে, জার্মানরা আমাদের আপন জন; আমাদের আত্মীয়। সমুদ্র মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়; আবার আপনও করে।

ব্রিমেনে অনেকেরই চিঠি এসেছে। এজেন্টের লোক এই চিঠির মর্ম বোঝে—তারা জানে, বাড়ির খবরের জন্য জাহাজের লোক ব্যাকুল

হয়ে অপেক্ষা করে। ক্যাপটেনের ডে-রুমে বসে ডিউটি অফিসার চিঠিগুলো এজেণ্টের কাছে বুঝে নিয়ে ক্রুদের চিঠি আলাদা করে সারেঙের হাতে দিয়েছে। অফিসারদের চিঠি নিজের কাছে রেখেছে। 'আমার চিঠি আছে, আমার' বলতে বলতে এখনই সবাই এসে নিয়ে যাবে।

দু' একখানা চিঠি পেলে কারও মন ভরে না। রাবণ দত্ত এখানে এসে তিনখানা চিঠি পেয়েছে, চিঠিগুলো হাতে নিয়েই সে বলেছে—মাত্র তিনখানা? ডিউটি অফিসারকে পর্যন্ত বলেছে—আমার তো আরও চিঠি আসার কথা—দেখুন তো কোথাও পড়ে আছে কিনা! আসগর আলী পেয়েছে মোটে একখানা চিঠি। অন্যের চিঠি সে চেয়ে চেয়ে দেখছে আর বলছে,—আমার আর চিঠি গেল কোথায়? জবাব কে দেবে! কিন্তু যারা একটি চিঠিও পায় নি তারা হট্টগোল শুরু করেছে—যেন ক্যাপটেনের কোন দোষ, কোন গাফিলতির জন্য তাদের চিঠি আসে নি!

সমুদ্র আমাদের এমনি করেই গড়ে তোলে!

জাহাজ ভেড়াতে মোটে দুজন ডক-শ্রমিক এসেছিল। জার্মান শ্রমিক। শ্রমিক তাই কি—এসেছিল নিজেদের গাড়ি হাঁকিয়ে। কেনই বা নয়—মাইনে তো আর কিছু কম পায় না। কাজও এমন কিছু নয়—জাহাজ জেটির কাছাকাছি এলে রশি ধরে হাতে টেনে নিয়ে বোলার্ডের মাথায় গলিয়ে দেওয়া; নোঙর তো আগেই ফেলা হয়েছিল। জাহাজ এবার আর জেটি ছেড়ে ছুটোছুটি করতে পারবে না।

কাস্টমস্ ইমিগ্রেশনের লোক এসে দশ মিনিটে কাজ সেরে চলে গেলেন। লাঞ্চও খেয়ে যেতে বলা হলে তারা বললেন—ধন্যবাদ। বাড়িতে বৌ খাবার নিয়ে বসে আছে। গিয়ে এক সঙ্গে খাবো। বলা হল একটু কফি খেয়ে যেতে। কাস্টমস্ অফিসার বললেন—দেরি হয়ে যাবে। ধন্যবাদ।

রাজহংস এখন নিস্তব্ধ। যারা চিঠি পেয়েছে এবার তারা বসে বসে চিঠি পড়ছে। একবার, দুবার, তিনবার। আবার ঘর থেকে চিঠি না

আসা পর্যন্ত এই চিঠি আরও বারকয়েক পড়বে। ব্রিমেনে জাহাজ দেড় দুইদিনের বেশি থাকবে না বলে অনেকে উত্তর লিখতেও বসে গেছে। কিই আর করা যায়? এতদিনের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসে বাড়ির কথা আজ সবার যেন বেশি করে মনে পড়ছে—জীবনে এই প্রথম যেন তারা বিদেশে এসেছে। কেউ কেউ বাড়ির লোকের সঙ্গে ট্রাঙ্ক টেলিফোনে কথা বলার জন্যও তৈরী হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে কজনের ঘরে আর টেলিফোন আছে।

জেড্ডা ছাড়ার পর পনেরো দিনের সমুদ্রে কেউ কেউ অসুস্থ হয়েও পড়েছে। কারও গলা ব্যথা। কারও জ্বর। কারও পেটের গোলমাল। কারপেণ্টার মনিরাম গোলাঙ্কির বুকের অবস্থা ভাল নয়—বাঁদিকে ব্যথাটা খুব বেড়ে গিয়েছে। ডাক্তার ঠিক করাই আছে, সব বন্দরেই থাকে। সব কোম্পানীর সব জাহজের জন্যই। এজেণ্টের ট্যাক্সিতে মনিরাম চলে গেল ডাক্তারের কাছে।

জাহাজ ভেড়ার পর লোক আসার আর বিরাম নেই। সব কাজের লোক—ষ্টিভেডার, শিপ চ্যাণ্ডলার, মায় লণ্ড্রীম্যান পর্যন্ত। ফোরম্যান-চিফ অফিসারের সলাপরামর্শ শেষ হতেই মাল খালাসের কাজ শুরু হয়ে গেছে। তিন নম্বর ফলকা থেকে পাটের বেল নামিয়ে নেওয়া হচ্ছে। মাত্র দেড় হাজার টন মাল নামছে—সুতরাং কাজ শেষ হতে আর কতদিন। কাজে কারও গাফিলতি নেই। ফাঁকি দেবার মতলবও দেখা যায় না—স্ট্রাইক তো নেই-ই। সুতরাং শীগগীর কাজ শেষ হতে আর বাধা কোথায়।

রাতের বেলায় ডাক্তারের রিপোর্ট এলো—হার্টের ব্যাথা বাড়াবাড়ি বলে সোলাঙ্কিকে সোজা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে তার সব দায়-দায়িত্ব এজেণ্টের। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেখানে তার পাওনা গণ্ডা সে বুঝে নেবে। —কারণ কলকাতায় আমাদের হেড আপিস। সোলাঙ্কি সম্বন্ধে সব খবরাখবর এজেণ্টই এখন কলকাতায় পাঠাবে।

ব্রিমেন খুব পুরানো বন্দর। আটশ বছরের পুরানো। জার্মানীর

উত্তরে নরওয়ে সুইডেন দেশ। সেখানে লবন তৈরী হত না। ফসলের মধ্যে গম হত খুব কম। অথচ গম থেকে তৈরী পাউরুটি আসল খাদ্য বস্তু, আমাদের যেমন ভাত। উত্তরের দেশগুলো জার্মানী থেকে এইসব আমদানী করত; লবন আর গম। জার্মানীতে ছিল বড় রকমের নুনের খনি, ব্রিমেন আর হ্যামবুর্গের মাঝামাঝি লুনেবার্গে। ব্রিমেন বন্দর দিয়েই রপ্তানী হত লবন—আর উত্তরের দেশ থেকে আমদানী হত মাংস, কাঠ, চামড়া। এই সূত্রেই ব্রিমেন বড় হয়ে উঠল।

স্পেন পর্তুগালেও লবন রপ্তানী হত, আর সেখান থেকে জার্মানীতে আসত এলাচি, দারুচিনি লবঙ্গ, এইসব মশল্লার আদর ইউরোপের দেশে দেশে তখন খুব বেশি। মশল্লার ব্যবসা তখন বড় ব্যবসা, ভারতের তখন খুব নাম ডাক। কারণ ভারত মশল্লার দেশ। সোনা-দানা হীরামুক্তার দেশ। ধনীর দেশ! তার সঙ্গে ব্যবসা করে ধনী হবার ইচ্ছা তখন সবারই। তখন সুয়েজখাল ছিল না। ইউরোপের লোক জলপথে ভারতে পৌঁছাবার উপায় খুঁজতে লাগল। শুরু হল প্রতিযোগিতা। কলম্বাস ভারতে পৌঁছবার মতলবে তিনখানা জাহাজ নিয়ে বেরোলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন আমেরিকায়। এক দিন অবশ্য ইউরোপের বনিকরা ভারতে পৌঁছল, ইংরেজরা ভারত আর মালয়, ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়া দখল করে নিল। সে কথা থাক।

ব্রিমেন শহরে আমরা হেঁটে ফিরছিলাম। দেখা হল একটি মাদ্রাজী লোকের সঙ্গে। তার চাপদাড়ি, জিন প্যাণ্ট, কালো কোটের সঙ্গে মিলিয়ে লোকটিকে বড়ই কালো দেখাচ্ছিল। জাহাজে কোন দক্ষিণ ভারতীয় লোক আছে কিনা লোকটি জিজ্ঞেস করল। আমরা আসছিলাম হেঁটে, সে সাইকেল চেপে আগেই আমাদের জাহাজে পৌঁছে গিয়েছিল। এবং জাহাজের মাদ্রাজী ক্রুর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিয়েছিল!

ব্রিমেনে একটি মরিশাসের লোকের সঙ্গে দেখা হল। দেশের জাহাজে ভদ্রলোক ছিলেন চিফ এঞ্জিনীয়ার। পশ্চিম জার্মানীতে কাজের সন্ধানে এসে টাকা কড়ি, পাসপোর্ট ইত্যাদি হারিয়ে ফেলেছেন —ট্রেনে গুণ্ডারা নাকি তার মালপত্র নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

ব্রিমেন ভাল করে দেখার সময় না হলেও এক মহিলার সঙ্গে আমাদের আলাপ হল। নাম তার মার্গারেট গুল। তার কাছেই জার্মানীতে নেজাতীর কথা আমাদের কিছু জানার সুযোগ হল। সে-কথা এবার বলব।

॥ ২২ ॥

জার্মানীর মাটিতে কাল একটু পা রেখেছিলাম মাত্র। ভেবেছিলাম আজ কোন গাঁয়ের দিকে চলে যাব। কোন দেশের আসল চেহারা তো তার গাঁয়ে ঘরেই আঁচ করা যায়। কিন্তু আজকের দিনটি আমাদের পক্ষে খুব ভাল নয়—কিছু সমস্যার মধ্যে আজ আমরা জড়িয়ে পড়েছি। রাজহংস জাহাজের অফিসার, পেটি অফিসার মিলে আঠারো জন, ক্রু তিরিশ জন। ক্রুদের ডাইনিং হলে আজ কিছু গোলমাল বেঁধেছে। ডেক ক্রুদের দুপুরের খাবার মাছ ভাজাটা কিছু নাকি কাঁচা ছিল, বিকেলের মাংসে নুন কম। ঝাল বেশি। বিকেলে খাবার সময় হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে—একদল বলছে ভাণ্ডারী আসগর আলী মোটেই রাঁধতে জানে না; আবার কেউ কেউ বলছে,আসলে রান্নায় ওর মনোযোগ নেই। মজিদ ট্যাণ্ডেল এই দলের। সে ভাণ্ডারীকে গাল-মন্দ করেছে। সারেঙ বলেছে, রান্না যে রোজই ভাল হবে তার মানে নেই—বাড়িতেও হয় না। সুতরাং অরুণ মিত্র ট্যাণ্ডেলকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, ভাণ্ডারীর উপর মেজাজ দেখাবার অধিকার ট্যাণ্ডেলের নেই। কিন্তু অশান্তি বন্ধ হয় না; শেষ পর্যন্ত চিফ অফিসার এসে কোন রকমে গোলমাল মিটিয়ে দেন।

কিন্তু সকালের দিকে বলতে গেলে জাহাজের মস্ত ফাঁড়া গেছে। মাল খালাসের সঙ্গে সঙ্গে কিছু মাল ভরাটের কাজও এগিয়ে চলছিল - ষাট টন ওজনের দুটো ভারি ট্রাক জাহাজে তুলে নেবার ব্যবস্থা তখন সম্পূর্ণ। এজন্য ভারি মালের জন্যু ডেরিক কাজে লাগানো হচ্ছিল।

সমুদ্রে বসে জন্তুটাকে বিশেষ পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল ; কোন্ দোষই তখন পাওয়া যায় নি। কিন্তু ডক থেকে ট্রাক তুলতে গিয়ে অঘটন ঘটল। জন্তু গেল বিকল হয়ে, ট্র্যাকটি আটক হয়ে পড়ল জাহাজ আর ফলকার ধার বরারব। জাহাজের লোক, বাইরের শ্রমিক কাছেই কাজ করছিল—জন্তু কারও মাথায় পড়লে মৃত্যু ছিল নির্ঘাত। সুখের বিষয়, কেউ আহত পর্যন্ত হয় নি। ট্রাক বা জাহাজের কোনও ক্ষতি হয় নি। শেষ পর্যন্ত বন্দর থেকে ভাড়া করে ফ্লোটিং ক্রেণ এনে ট্রাক দুটো জাহাজের খোলে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘণ্টায় তিরিশ হাজার টাকা ভাড়া—মোট খরচ পড়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকা।

জন্তু দুর্ঘটনার জের সারাদিনই চলেছিল, তার উপর বাড়তি অশান্তি এসেছিল ক্রুদের খাওয়া নিয়ে। জাহাজের জীবনে অবশ্য এমন অনেক হয়।

রাজহংস আজ রাতে ব্রিমেনেই থাকছে। মার্গারেট গুল এসে গিয়েছেন। এবং আমাদের সঙ্গেই খেয়ে নিয়েছেন। মসল্লা-কষা মাংস, আলুদম, ছোলাডাল দিয়ে মার্গারেট দিব্যি চাপাতি খেয়ে নিলেন, আমাদের মতো হাতে তুলে। পায়াস খেলেন হাত চেটে। ভারতের কোন্ প্রদেশের লোক কি খায়। কি তাদের আচার ব্যবহার মার্গারেটের সব জানা আছে ; জানার তার সুযোগ হয়েছে।

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। ভারতবর্ষ বৃটিশের দখলে। দেশ স্বাধীন করতে ভারতীয়রা তখন বৃটিশের সঙ্গে খুব লড়ছে। বৃটিশের চোখে ধূলো দিয়ে সুভাষচন্দ্র এসেছেন জার্মানীতে, বিদেশ থেকে সংগ্রাম চালিয়ে দেশ স্বাধীন করতে। জার্মানীতে তখন যে সব ভারতীয় ছিলেন নেতাজী সুভাষ তাদের নিয়ে একটি দল গঠন করলেন, নাম দিলেন তার স্প্রিঙ্গিং টাইগার। শত্রুর উপর বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে সব সময় তারা তৈরী থাকতেন। স্প্রিঙ্গিং টাইগারের শিক্ষা শিবির ছিল জার্মানীর দু জায়গায়, ফ্রাঙ্কেনবার্গ আর ব্র্যাণ্ডেন বার্গে। মার্গারেটের বাবা ডঃ হেরম্যান গুল ছিলেন ফ্রাঙ্কেনবার্গ শিক্ষা শিবিরের কর্তা।

ছেলেবেলায় মার্গারেট বাবার কাছেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সব শিক্ষা

পেয়েছেন—আমাদের দেশের পূব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের সীমানা কি, কি ধরণের লোক কোথায় বাস করে। কি তাদের ভাষা, খাদ্য, পোশাক, ধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে বাবাই তাকে জ্ঞান দিয়েছিলেন ; এমনকি ভারতবর্ষের গৌরবময় অতীত ইতিহাস সম্বন্ধেও। তখন থেকেই মার্গারেট ভারতবর্ষকে ভালবাসতে শিখেছিলেন।

প্রশ্ন করলাম—আপনি নেতাজীকে দেখেছেন ?

মার্গারেট গর্বের সঙ্গে বললেন—দেখেছি মানে ? তাঁর সঙ্গে সাথে ফিরেছিও—১৯৪২ সালেই তিনবার। তখন আমার বয়স মোটে দশ বছর।

'নেতাজীকে দেখে কি মনে হয়েছে ?'

তাঁর সব কথা তখন বুঝতাম না ; কিন্তু মনে হত, এমন একটি মানুষকে দেখছি, যাকে ভোলা যায় না—যার স্মৃতি সারা জীবন বহন করা যায়।

অনেক প্রশ্নের অনেক জবাবই মার্গারেট দিলেন। কিন্তু নেতাজীর কথা বলতেই তার চোখ মুখে দীপ্তি দেখা যাচ্ছিল। মার্গারেটের বাবা অনেক আগেই মৃত। নেতাজীও অন্তর্হিত—জার্মানীও অনেক বদলে গেছে। কিন্তু সেদিনের সেই জার্মানীর মাত্র দশ বছরের এক মেয়ের মনে পরাধীন ভারতের এক অগ্নিতেজা নেতা যে ছাপ ফেলেছিলেন, আজও লোকে তা গল্পের মতো শোনে ; মার্গারেটের কাছে আজ তা যেন এক মস্তবড় সম্বল।

মার্গারেট গুলের বাড়ি স্যাক্সনি প্রদেশে। স্প্রিঙ্গিং টাইগারের বড় শিক্ষাশিবির ছিল স্যাক্সনিতেই। অনেকদিন আগে জার্মানীর অবস্থা ছিল ভারতের মতো ; তিনশ যাটটি ছোট ছোট রাজ্যে জার্মানী বিভক্ত ছিল—প্রাসিয়া, অস্ট্রীয়া, বোহেমিয়া, স্যাক্সনি ইত্যাদি। স্থানীয় জমিদার লোকেরা একেকটি রাজ্যের মালিক সেজে বসে আপন আপন রাজ্য শাসন করতেন। মাঝে মাঝে অবশ্য চেষ্টা চলেছে, সবগুলি রাজ্যকে একত্র করে এক জার্মানী গঠন করতে। সফল হয় নি। শেষ পর্যন্ত নেতাজীর মতো একজন শক্তিশালী পুরুষ, এক জার্মানী গঠন

করেন। ভদ্রলোকের নাম বিসমার্ক। প্রায় ~~ষোলোশ~~ বছর আগে তিনি এক জার্মানী গঠন করেছিলেন—১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তা বজায় ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ১৯৪৫ সালে শেষ হয়। জার্মানী যায় হেরে। এবং ভাগ হয়ে পূব আর পশ্চিম জার্মানীতে, আমাদের বাংলা যেমন ভারতের স্বাধীনতার সময় ভাগ হয়ে গিয়েছিল – পূব পাকিস্তান (এখন বাংলাদেশ) আর পশ্চিমবঙ্গে।

ভারতীয় জাহাজ ব্রিমেনে এলেই মার্গোরেট চলে আসেন, সবার সুখ দুঃখের খবর নেন, জাহাজীদের নানারকমে সাহায্য করেন। যাদের বয়স কম, বিশেষ করে যারা ক্যাডেট, তাদের নিয়ে মার্গারেট বাইরে যান, ঘুরে ঘুরে শহর দেখান, দূর-গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে জার্মানীর গ্রাম ঘর, জোতজমি, দৃশ্য শোভা ইত্যাদি দেখিয়ে আনেন। ব্রিমেনে অনেকে বলে তাকে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল।

শুধু ভারতীয় নয়, বাংলাদেশী পাকিস্তানী জাহাজে গিয়েও মার্গারেট সবার খোঁজ খবর নেন। অল্পদিন আগের কথা—বাংলার তরনী নামে এক জাহাজের ক্যাডেট আব্দুল মুন্নাফ গ্যাসট্রিক আলসারে মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। মার্গারেটের চেষ্টাতেই তার ভাল চিকিৎসা হয়; মুন্নাফ বেঁচে ওঠে।

একটি পাকিস্তানী জাহাজের নাম অর্‌মাজড্‌, তার ক্যাডেট ইমতিয়াজ ভুগছিল রক্ত দূষনে। চিফ অফিসারের নাকি স্ক্রু ঢিল ছিল—জাহাজে কিছুতেই ডাক্তার ঢুকতে দেবে না। মার্গারেট গিয়ে ঐ জাহাজে হাজির হন, নিজে সঙ্গে করে ইমতিয়াজকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। ডাক্তাররা তখন বলেন—আর এক ঘন্টা পরে এলে রোগীকে বাঁচানো যেত না!

সত্যি, পৃথিবীতে এখনও অনেক ভাল লোক আছে!

॥ ২৩ ॥

রাজহংস এল্‌বে নদী বেয়ে হ্যামবুর্গে আসছে। খোস মেজাজে। বড় ঘরের আদুরে মেয়ে যেন - শ্বশুর ঘর থেকে বাপের বাড়ি আসছে। — পাইলট পথ দেখিয়ে নিচ্ছে। আগে পিছে দুখানা টাগবোট চলছে, মাথার উপর হেলিকপ্টার বন্‌বন্ করে উড়ছে। রাজহংসর গায়ে যাতে আঁচড়টি না লাগে। সবাই হুসিয়ার। সকাল নটা বাজে। আকাশ নীলিমায় নীল। মেঘহীন। সোনারঙের রোদ দিকবিদিক ঝলমল করছে।

এল্‌বে নদী থেকে নালা কেটে নিয়ে অনেক জেটি তৈরী হয়েছে। অসংখ্য। সারা পৃথিবীর অজস্র জাহাজ সেখানে ভিড় করে আছে। যাচ্ছে আসছেও অনেক জাহাজ। রোজ পঞ্চাশ খানার কম নয়। বড় বন্দর হিসেবে সারা পৃথিবীতে হ্যামবুর্গের খুব নাম ডাক। এখানকার ডকে কোন লকগেট নেই। এল্‌বে নদী খুব গভীর, জোয়ারের তেজ কম — লকগেট তৈরী করার দরকার হয় নি। কিন্তু এই নদীর জল বড় খারাপ, মনে হয় পঁচিশ ভাগই তার তেল-ময়লা। মাছ ফাচ কিছুই নেই। হ্যামবুর্গ বারোশ বছরের পুরানো বন্দর। জাহাজের তেল-কালি মিশে জল খারাপ হতে শুরু করেছিল সোয়াশ' বছর আগে। তখন জরিমানার ভয় ছিল না। এখন সব জাহাজ সব সময় সতর্ক থাকে — একটুখানি তেল জাহাজ থেকে পড়েছে তো ব্যস মোটা টাকা জরিমানা দাও !

ওঙ্গার চোখে চলন্ত জাহাজ, এলবে নদীর নোংরা জল তেমন পড়ছিল না — ছোট টাগবোট এতবড় জাহাজকে কি করে আলগোচে ঠেলছে ওঙ্গা তাই মনোযোগ দিয়ে দেখছিল — ছোট টাগ এত জোর কোথায় পায় ভেবে পাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত ওর চোখ পড়ল এলবে নদীর বাঁ তীরে। আমি বললাম্ — এখন কি দেখছ ?

ওঙ্গা একটা সংক্ষিপ্ত জবাজ দিল—ছবি দেখছি।

আমি তো অবাক। ছবি কোথায়? জলের ধারে খানিক জায়গা জুড়ে মিহি বালির সাদা চাদর। নদীর তীর জুড়ে সবুজ গাছের সার; পরপর এক একটা বাড়ি—লাল ইটের গাঁথনি। চৌকো চৌকো সাদা রঙে ভাগ করা কাচের জানালা। সকাল বেলার সোনাল রোদে চক-চক করছে। সবমিলে যেন শিল্পীর হাতে আঁকা পটের ছবি। এখানে এলে আসলে ছবি ছাড়া আর কিছু কেউ ভাবতেই পারে না—ওঙ্গাও পারে নি। ওর বুদ্ধি আছে বলতে হবে, মনে কবিতা আছে; তাই কাব্য করে বলতে পেরেছে ছবি দেখছি। আর কেউ হলে হয়তো বলত—গাছপালা দেখছি। বাড়িঘর দেখছি।

ডক থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় মোটর লঞ্চ ছাড়ছে। বড় বড় সব মোটর লঞ্চ। জাহাজীদের নিয়ে নামিয়ে ওপারে ল্যাণ্ডুংস্ব্রাকেনে, যার অর্থ, পার-ঘাটা। নামবার জায়গা। জার্মান ভাষায় শব্দগুলো এমনি ভোমা ভোমা। মুখভরা উচ্চারণ। জাহাজ থেকে এসে পার-ঘাটায় নেমে ট্যাক্সি নাও। নয়তো পাতাল রেলে গিয়ে বসে পড়—শহরের যেখানে খুশি চলে যাও। ডক থেকে নদী পার হওয়ার অবশ্য আরও পথ আছে; এলবে নদীর জলের তলে—সেখানে মস্তবড় টানেল পথে ট্যাক্সি চলে। গাড়ি চলে। আমরা জলের নিচে টানেল পথেই গিয়েছিলাম। ওঙ্গা তো কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। কারণ টানেল দেখতে অন্য সব সড়কের মতোই—তবে ছুটো দেয়াল আর ছাদ রয়েছে। কিন্তু ছাদের উপর দিয়ে নদীর জল বইছে তাকি ভাবা যায়।

ব্রিমেনের শ'দেড়েক মাইল উত্তরে হ্যামবুর্গ শহর। লোক সংখ্যা কুড়ি লাখ। যাদুঘর-থিয়েটার-ব্যালে। মাটির তলে রেল, জলের তলে সড়ক ইত্যাদি নিয়ে হ্যামবুর্গ বেশ জমজমাট শহর! নিউইয়র্ক, লণ্ডনের মতো। যে বিসমার্কের কথা আগে আমরা বলেছি, জার্মানীকে যিনি এক করেছিলেন, তিনি হ্যামবুর্গেও কিছুদিন বাস করেন। হ্যামবুর্গের ফ্রেডারিক্স্রুতে এখনও তাঁর সমাধি আছে। তার চারদিকে রয়েছে ঘনবন—বনের শান্তি সেখানে বিরাজ করছে। হ্যামবুর্গের অবশ্য সব

জায়গাতেই সবুজের ছড়াছড়ি—বাগান, পার্ক, গাছপালার অন্ত নেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হ্যামবুর্গের বড় দুর্দিন গেছে—হ্যামবুর্গের মতো এতো বেশি বোমা জার্মানীর আর কোথাও পড়ে নি। পাঁচ ভাগের চার ভাগ শহর তখন বোমার ঘায়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। লোকের ঘরে খাবার ছিল না। পোশাক ছিল না; দুর্দশার শেষ ছিল না। এখন দেখছি নতুন হ্যামবুর্গ। বিগত চল্লিশ বছরে আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছে।

ল্যাঙ্গুংসব্রাকেন থেকে হাঁটতে হাঁটতে আমরা সীম্যানস্ মিশনে গিয়েছিলাম। দেখে অবাক হলাম, ওখানে অনেক কটা সীম্যানস্ ক্লাব রয়েছে—বৃটিশ, জার্মান, নরওয়েজিয়ান ইত্যাদি মিলে বারোটি। অন্যান্য বন্দরে সাধারণত একটি করেই থাকে। এই ক্লাবগুলো নাবিকদের বড় উপকার করে। সন্ধ্যা সাতটায় জাহাজ বন্দরে এলে তো পোষ্ট অফিস আর খোলা থাকে না। সীম্যান মিশনে যাও—স্ট্যাম্প, এয়ার লেটার সব পাবে। যখন সমুদ্রে ছিলে তখনকার পত্রিকা দেখতে চাও? ওখানে পাবে। গল্পের বই, উপন্যাস চাও? ওরা দেবে। ফ্রি। ওখানে বসে গল্প সল্প কর, বই পড়, কোক কিনে খাও, নয়তো বিলিয়ার্ড খ্যালো—কোন অসুবিধা নেই। আরও সুবিধা আছে—শহরের কোথায় কি দেখার আছে। যাতায়াতের ব্যবস্থা কি, ওরা সব বলে দেবে। জাহাজের বন্ধু বান্ধব মিলে কোন বিখ্যাত জায়গা দেখতে যেতে চাও? ওরা সাহায্য করবে, সম্ভব হলে শস্তায় ডিলাক্স বাস রিজার্ভ করে দেবে, ক্লাবের গাড়ি দিতে পারলে ওরা নিজেরাই সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

সীম্যান্স্ মিশন গড়ে ওঠার পেছনে একটি ইতিহাস আছে। ইউরোপের যে সব দেশ ভারতবর্ষ খুঁজতে ঘর থেকে বেরিয়েছিল সেই সব দেশ পরে খুব লাভবান হয়েছিল। ভারতের জলপথ তখন খুলে গেছে। জাহাজী ব্যবসায়ে সবাই ফুলে ফেঁপে উঠেছে—জাহাজ ভরে মশল্লাপাতি, সোনাদানা ইত্যাদি আমদানী করে। যে দেশের যতো বেশি জাহাজ। সে দেশ তখন ততো বেশি ধনী।

তখন কলের জাহাজ ছিল না। জাহাজী লোকদের ঘন ঘন বন্দরে ফিরে আসাও সম্ভব হত না। একটানা দুতিন বছর ঘরছাড়া হয়ে তুমি সমুদ্রের কত ধকল সহ্য করেছ। টাটকা ফলতরকারি খেতে না পেয়ে স্কার্ভিতে ভুগে মরেছ. শুকনো মাইনে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কেউ ঘরে ফিরেছ। ব্যবসায়ীরা লালে লাল হয়ে গেছে। আশ্চর্য, নাবিকদের দানের কথা তারা ভোলে নি। মোটা টাকা চাঁদা দিয়ে তারা সীম্যান্স্ মিশন তৈরী করে দিয়েছে। তোমার জাহাজ বন্দরে এসেছে? মিশনের লোকদের তারা বলে দিয়েছে—নাবিকদের খাতির-যত্ন কর, সেবা দাও, তাদের আপন করে নাও—তারা যেন বুঝতে পারে; তোমার যা আছে, তাদের সঙ্গে ভাগ করে তা ভোগ করছ। সুতরাং বন্দরে এসে নাবিকরা যেন না ভাবে, লিভারপুলের লোক হয়ে লণ্ডনে এসে বেকার পড়ে আছে—তাদের দেখবার কেউ নেই! মানুষের মনের এই উদারভাব থেকেই শুরু হল স্টেলামারিস, ফ্লাইং এঞ্জেল ক্লাবগুলো। ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, জার্মানী ইত্যাদি দেশের বন্দরে বন্দরে গড়ে উঠল সীম্যানস্ মিশন—শেষপর্যন্ত আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ডে।

হ্যামবুর্গেও জাহাজ বেশি দিন থাকছে না, কারণ মাল ভরাটের কাজ তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছে। খুব বেশি কিছু ঘুরে দেখা সম্ভব নয়। আপাতত আমরা চলেছি লুবেক নামে একটি জায়গায়। লুবেক সাবেক কালের শহর। হ্যামবুর্গ থেকে ষাট মাইল দূরে। বাল্টিক সাগরের কাছাকাছি।

বড় সড়ক ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি। শহরের দূরে ঝকঝকে সড়ক বেশ কয়েকটি দেখতে পাচ্ছি। সবই নতুন তৈরী। বড় সড়ক থেকে বেরিয়ে কিছু রাস্তা গেছে গাঁয়ের দিকে। বড় সড়কে বাস চলছে। প্রায় খালি বাস। বেশির ভাগ লোকের গাড়ি আছে, প্রতি দু'জনের একজনের। বাসে চড়ার লোক কম। এদেশে গাড়ি-হাঁকানো লোককে বাসের খবর জিজ্ঞেস করলে কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে বলে—'খুব দুঃখিত। বাসের খবর আমার জানা নেই, কোন খবর

রাখাই হয় না।' তার কথা শুনলে মনে হয়, নিজের গাড়ি থাকা যেন অপরাধ!

জার্মানীর দূরে গাঁয়ে বাড়িঘর, ক্ষেতখামার হাঁ করে দেখছিলাম। সবই একরকমের—সেই লাল ইট, কাচের জানালা, সাদা রঙের বাড়ি। ঘরে ঘরে চিমনি রয়েছে। রান্নাঘর আর ফায়ার প্লেসের ধোঁয়া চিমনি পথে বেরিয়ে যাচ্ছে। সব বাড়ির সামনেই একটা করে মোটরগাড়ি পড়ে আছে। উঠানের উপরেই। গ্যারাজ রাখার বালাই কারও নেই। কারণ গাঁয়ের বাড়ি বলে সামনে অনেক জায়গাই খালি পড়ে আছে। এগুলো বেশির ভাগই কৃষকদের বাড়ি। উঠোনের একদিকে জমি-চষা ট্রাক্টরও পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। পাশের মাঠে ঘাস বোনা রয়েছে। সেখানে গরু ভেড়া চড়ছে।

সব বাড়ির সীমানা জুড়ে রয়েছে ওক, বীচ, পাইন গাছ। আপেল আর পেয়ার্স গাছও দেখা যাচ্ছে। অনেক গাছে ছোট্ট ঘটের মতো পেয়ার্স ঝুলছে। এগুলোই আমাদের দেশে ন্যাসপাতি। তবে পেয়ার্স আরও রসাল আর মোলায়েম এবং আরও বেশি মিষ্টি। কোন কোন বাড়িতে গাছে এত কমলালেবু ফলে আছে, গাছের পাতা পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেছে হলুদ রঙের কমলা ফলে।

এবার আমরা লুবেক শহরে এসে গিয়েছি। যুদ্ধের দিনে লুবেকের অনেক ক্ষতি হয়েছিল; একটি বহু পুরানো গীর্জা একেবারে ভেঙে পড়েছিল; এখন নতুন করে তৈরী হচ্ছে। গীর্জার মাথায় উঠে চার-দিকে তাকিয়ে মনে হল, ইউরোপে এমন ঘিঞ্জি শহর আর কখনও দেখি নি। ট্রাভে নদী লুবেকের পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে এসে উত্তরে বেঁকে পূব দিকে বয়ে চলেছে— গীর্জার মাথায় দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে যেন দুটো নদী। ট্রাভে নদীর পূব পাড়ে পূব-জার্মানীর খানিকটা দেখতে পেলাম। শুধু মাঠ আর মাঠ। প্রাশিয়া এখন পূব জার্মানীতে পড়েছে। অনেক জগদবিখ্যাত জার্মন লোক পূব-জার্মানীতে জন্মেছেন—আমাদের যেমন জগদীশ বসু, পি-সি-রায়, মেঘনাদ সাহার বাড়ি ছিল আগে পূব বাংলায়।

লুবেকে টম্যাস ম্যানের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আমরা ছবি তুললাম। টম্যাসমান জার্মানীর এক বিখ্যাত ঔপন্যাসিক—সাহিত্যে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার জন্য তিনি জার্মান জাতির খুব নিন্দা করেন। নিজের জন্মস্থান সম্বন্ধেও তিনি নাকি বলেন - লুবেক নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। লুবেকের লোক গোল্লায় যাক, তারা হিটলারকে সমর্থন করা পাপের প্রায়শ্চিত্য করুক। লুবেকের লোক এইজন্য এখনও টম্যাসম্যানের উপর চটে আছে। যুদ্ধের দিনে টম্যাসম্যান, জার্মানী ছেড়ে পালিয়ে যান। তারপর ফিরেও আসেন, তবে লুবেকে নয়, পূব জার্মানীতে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আমাদের ড্রাইভার মিঃ এনো বললেন—লুবেকে এসে তোমরা বলছ টম্যাসম্যান, আমরা বলি মাজিপান। মাজিপানের নামের কাছে কেউ কিছু নয়!

মাজিপান লুবেকের এক বিখ্যাত টফি, শান্তিপুরের যেমন নিখুঁতি। রসগোল্লা, সন্দেশ তো সারা বাংলাতেই তৈরী হয়—নিঁখুতি শুধু শান্তি-পূরে। মাজিপানও শুধু লুবেকে। লুবেকে এলে সবাই মাজিপান কেনে প্রাণভরে।

মিঃ এনো ব্রিমেনের লোক, স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে বলে এখন থাকেন হ্যামবুর্গে। চাকুরি করেন। নিজেই রান্না করে খান।

লুবেক ছাড়ার আগে ম্যাকডোনাগু থেকে আমরা কিছু খাবার কিনলাম। ইউরোপ জুড়ে ম্যাকডোনাল্ডের দোকান রয়েছে; এমনকি আমরা জাপানেও দেখেছি। এই দোকানের খাবার বেশ নাম করা। হ্যামবার্গার, ফ্রেঞ্চ ফ্রায়েড পটাটো, বেসনে ভাজা মুরগীর টুকরো, আইসক্রিম ইত্যাদি অনেক কিছু কিনলাম। মাথাপিছু আমাদের খরচ পড়ল তিরিশ টাকার মতো।

ফেরার পথে গাড়িতে বসেই আমরা খাবার খেলাম। মিঃ এনো কিছুই খেতে চাইলেন না। বললেন—ম্যাকডোনাল্ডের খাবার আমার পছন্দ নয়। আসল কারণ এই, আমাদের খাবারে ভাগ বসাবার ইচ্ছা তার ছিল না। আমরা অবশ্য তার খাবারও কিনে নিয়েছিলাম। কিন্তু

পর-খেকো হওয়ার লোক মিঃ এনো একেবারেই নন। শেষ পর্যন্ত একটা আইসক্রিম তিনি আমাদের পেড়াপিড়ীতেই নিলেন।

খাবারের খালি প্যাকেটগুলো অনায়াসে রাস্তার ধারে ছুঁড়ে ফেলা যেতো, কিন্তু আমরা গাড়িতে জমিয়ে রাখলাম। এখানে সবাই তাই করে। কেউ বলে না দিলেও। নিজেদের রাস্তাঘাট কেউই নোংরা করতে চায় না।

বাস রাস্তাটি আবার তাকিয়ে দেখলাম। মনে হল, এ যেন পৃথিবীর মাটির উপর তৈরী রাস্তা নয়—সিমেন্ট-গোলা রং গায়ে মেখে কোন্ রূপ কথার দেশ থেকে যেন উঠে এসেছে!

॥ ২৪ ॥

আমাদের হেড আপিসের শেষ নির্দেশে এবার আমরা যাচ্ছি ইংলণ্ডে! এবার এলবে নদীর ভাঁটি পথে চলতে হল সাত ঘণ্টার মতো—সাতঘণ্টা পরে এলাম উত্তর সাগরে। তারপর প্রায় সোজা পশ্চিমে চৌদ্দ ঘণ্টা চলার পর জাহাজ ভিড়ল গিয়ে মিড্‌ল্‌স্‌বরোতে। আমাদের প্রথমে যাবার কথা ছিল লণ্ডনে কিন্তু যেতে হল জার্মানীতে। জার্মানী সম্বন্ধে কৌতূহল অবশ্য অনেকেরই ছিল, বিশেষ করে আগে যারা সেখানে যায় নি। ব্রিমেন হ্যামবুর্গের কথা এখনও সবাই বলাবলি করছে। অনেকেই ডক এলাকা থেকে দূরে ব্রিমেনের আসল শহর দেখে এসেছে। ট্রামে উঠে গোটা ছয় সাত স্টপ গিয়ে নেমে পড়, শহর ছাখো, আবার ট্রামে উঠে ফিরে এসো। ভাড়া? যাতায়াতে কম পক্ষে পঁচিশ টাকা। তাও আবার ট্রামে কণ্ডাক্টর নেই—ড্রাইভার সিটের পাশ দিয়ে উঠতেই তাকে পয়সা দিতে হয়। বেসামাল ভিড় নেই এই যা।

দোকানে দোকানে বিকিকিনির রকম আর জিনিসপত্র দেখেও সবাই খুব অবাক—ইলেকট্রিক, ইলেকট্রনিক্‌স্‌, ইসপাতের জিনিসই

বেশি। দোকানে দোকানে অজস্র জাপানী ঘড়ি, ক্যামেরা, টি-ভি, ভি-সি আর রয়েছে অথচ পশ্চিম জার্মানীতেও কিন্তু উন্নত মানের এই সব জিনিস তৈরী হচ্ছে। তবু ওরা আমদানী করে।

জাহাজীদের পক্ষে কিছু সুবিধা আছে, ব্রিমেনের ডকের কাছে তিনটে দোকান আছে যেখানে ট্যাক্স দিতে হয় না। মাল কিনলে দোকানদার কাস্টমস্ থেকে ছাড় করে নিয়ে এসে জাহাজে পৌঁছে দেয়— সে জাপানে তৈরী জিনিসই হোক, কিংবা আমেরিকান ক্যামি সাবান, অথবা বিলেতের উইলফিনসন ব্লেডই হোক। ট্যাক্স বাদে যে দাম পড়ে তা খাস জাপানের মতো শস্তা না হলেও আমাদের কাছে খুব কম মনে হয় না — আমাদের দেশের হিসাবে রোজগার করে জার্মানীতে খরচ করলে তো বেশী লাগবেই। অবশ্য জার্মানীতে রোজগার করলে এসব জিনিসের দাম তো খুব কম পড়ে। সাড়ে বারো টাকার ট্রাম ভাড়া কি আর ওদেশী লোক খুব বেশি মনে করে।

আমি একটা জিনিস খুব খুঁজে ফিরছিলাম মণ্ট ব্লাঙ্ক কলম। এক বন্ধুর জন্য। দোকানদার দাম বলল, পনেরো শ' টাকা। ভোমা সাইজের কলম, চেহারায় লক্ষ্মীশ্রী নেই। বিশেষ করে দাম দেখে কেনার ইচ্ছা উবে গেল।

জার্মানীর কথা আমরা অনেক শুনেছি, বিশেষ করে যুদ্ধের পর হ্যামবুর্গ, ব্রিমেনের কথা। ১৯৪৫-৪৬ সালের হ্যামবুর্গ; ব্রিমেন। তখন বন্দরে জাহাজ এলে নাকি শহরের অনেক মেয়েছেলে জাহাজে চলে আসত, সারাদিন কাজকর্ম করে দিত শুধু দুবেলা দুটি খাবার বিনিময়ে। চল্লিশ বছর পরে লোকের অবস্থা আজ এতো ফিরেছে, তা কল্পনাই করা যায় না।

দু'শ বছর আগেও কিন্তু জার্মানীর অবস্থা খুব খারাপ ছিল। একদিকে ধনী জমিদার, অন্যদিকে গরিব চাষী— এই নিয়ে তখনকার জার্মানী। জমিদারের জমিতে দিনের বেলায় চাষীরা বেগার খাটত, আর রাতে চাঁদের আলোয় নিজেদের জমিতে কাজ করত। শীতের দেশ— পেটে ক্ষুধা, পরণে শীত-কাপড় নেই।

১৯৩৩ সালের জার্মানীতে সত্তর লক্ষ লোক বেকার। হিটলার তখন সবে দেশ-নেতা হয়ে দেখা দিয়েছেন। চার বছরের মধ্যে লোকের বেকারী গেল কেটে ; ১৯৩৭ সালের জার্মানীতে কেউ আর বেকার নেই। এমন কি কাজের লোক তখন কম, বিশেষ করে জাহাজী। ভারতীয় আর চীনা নাবিক নিয়ে জাহাজ চালাতে হচ্ছে। ১৯৩৯ সালে জার্মানী শুরু করল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটল পরাজয়। তারপর দুর্দিন।

এখন এত সুদিনের মধ্যেও পশ্চিম জার্মানীতে তিরিশ লক্ষ লোক বেকার। যারা রোজগার করে তাদের আয়ের শতকরা চল্লিশ টাকা কেটে নিয়ে বেকার ভাতা দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং বেকারদের অবস্থা তেমন শোচনীয় নয়।

এবার ইংলণ্ড এলে কি হবে—লণ্ডন না যাবার আফসোস অনেকেরই রয়েছে—যেন লণ্ডন না দেখলে ইংলণ্ড দেখা কিছুই হয় না! লণ্ডন যে একেবারে বাতিল হয়ে যাবে কেউ ভাবতে পারে নি।

ইংলণ্ডের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ অনেকদিনের। ১৭৫৭ সাল থেকে শুরু করে একশ নব্বুই বছর ইংলণ্ডের লোক ভারতবর্ষ দখল করে রেখেছিল। তখন ভারতে ভাল চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য যা কিছু ছিল ইংরেজের হাতে। বিলেতে পড়াশুনা করলে তখন ভাল চাকরি মিলত, সমাজে খাতির বাড়ত। এখন অবশ্য বিলেত-ফেরতের বাড়তি কোন দাম নেই। আগের জৌলুস নেই।

খোলা সাগর হলেও আমাদের জাহাজে পাইলট ছিলেন। ইংরেজ পাইলট। উঠেছিলেন ইংলিশ চ্যানেলে। ব্রিমেনে নেমে না গিয়ে জাহাজেই ছিলেন ; আবার উত্তর সাগরে আমাদের দরকার বলে। এই পাইলট ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার শীগগীরই তর্ক বেঁধে গেল। পাইলট বললেন—'আমরা ইংরেজরা তোমাদের নৌবিদ্যা শিখিয়েছি, তাই এখন জাহাজ চালাতে পারছ।'

আমি বললাম—'মোটেই না-তোমরা ভারতে ছিলে মোটে ১৯০ বছর। তার আড়াই হাজার বছর আগে বাংলা থেকে জাহাজ যেত

সিংহলে। বাংলার সপ্তগ্রাম, তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে। বর্তমান সিংহল রাজ্য বাঙালীরাই প্রতিষ্ঠা করেছিল।'

পাইলটকে ভ্রূ কোচকাতে দেখে আমি আবার বললাম—দু'হাজার বছর আগে কেরালা আর মাদ্রাজ থেকে ভারতীয়রা শ্যাম, কম্বোজ (আজকের ক্যাম্বোডিয়া), মালয় আর ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলোয় পাড়ি জমাতো। আমাদের শিল্প, সাহিত্য, সভ্যতাই ঐ সব দেশের লোককে সভ্য করে তুলেছিল। নৌবিদ্যার তখন কিছুই তোমরা জানতে না, কিন্তু আমরা জানতাম। তার আগে থেকেই।

পাইলট তখন অন্য পথ ধরে বললেন—তোমাদের দেশ কখনও এক ছিল না, এক-ভারতবর্ষ আমরাই গড়ে দিয়েছি।

আমি বললাম—পাঁচ হাজার বছর আগেও এই দেশের নাম ছিল ভারতবর্ষ। ভারত অনেক রাজ্যে বিভক্ত ছিল বটে, প্রতি রাজ্যের আলাদা শাসনকর্তাও ছিলেন, কিন্তু তারা নিজেদের ভারতীয়ই ভাবতেন। এক-ভারত না হলে এমন হয়?

আমি আরও বললাম পাঁচশ বছর আগে ইউরোপের লোকে যে দেশ খুঁজে বের করতে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল, তা ছিল ইণ্ডিয়া। ভারতবর্ষ। এদেশে ব্যবসা করতে তিনশ বছর আগে লণ্ডনে যে কোম্পানী গঠন হয় তার নাম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, জাহাজগুলোর নাম পর্যন্ত ইণ্ডিয়াম্যান। সুতরাং ভারত যে এক ছিল তা তোমরা তখন থেকেই জানতে। সারা পৃথিবীও জানত।

পাইলট চুপ!

মিড্‌ল্‌স্‌বরো ছোট বন্দর। ইংলণ্ডের ইয়র্কশায়ারে। বন্দরের নাম মিড্‌ল্‌স্‌বরো বটে, কিন্তু কাছাকাছি কোন মানুষের বাড়িঘর নেই। মাইল দেড়েক দূরে আছে ছোট একটি রেলস্টেশন, নাম তার গ্রেঞ্জটন। গ্রেঞ্জটন থেকে মিড্‌ল্‌স্‌বরো শহর দশ মাইল দূরে। ছোট শহর, দেখার মতো সেখানে বিশেষ কিছুই নেই।

কিন্তু দেখতে হলে কুক-কান্ট্রিতে যেতে হবে অর্থাৎ মিড্‌ল্‌স্‌বরোর ষাট সত্তর মাইল দূর পর্যন্ত গ্রামে গঞ্জে। সেই সব জায়গায় স্মৃতি

ছড়িয়ে আছে ক্যাপটেন কুকের। কোথাও তাঁর জন্মস্থান, আর কোথাও বা তিনি গিয়ে থেকেছেন, পড়াশুনা করেছেন। কিংবা কাজ করেছেন। সে সব জায়গা সব নাবিকের পক্ষেই তীর্থস্থানের মতো। বিগত পাঁচশ বছরে তাঁর মতো নাবিক পৃথিবীতে কমই জন্মেছেন।

মিডল্‌স্‌বরো থেকে আমরা এবার কুক-কান্ট্রি দেখতেই রওনা হয়েছি।

॥ ২৫ ॥

হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে গ্রেঞ্জুটন স্টেশনটি একবার দেখে এলাম। কিন্তু স্টেশনের একি ছিরি! স্টেশনঘর বলতে কিছুই নেই, কোন স্টেশন মাস্টারও নেই। উঁচু দেওয়ালের লম্বা একটি ঘর রয়েছে বটে, দরজা তাতে একটিই। তালা মারা। একটা জানালা পর্যন্ত লম্বা ঘরটায় নেই। তার বাহির-দেয়ালে লেখা আছে গ্রেঞ্জুটন। গ্রেঞ্জুটনের পূর্বদিকে সমুদ্র। সমুদ্র পর্যন্ত গোটা তিনেক স্টেশন, পশ্চিমে মিডল্‌স্‌-বরো পর্যন্ত গোটা আটেক। নামগুলোও লেখা রয়েছে। ঘরটির সামনে আর পেছনে রয়েছে দুটো রেল লাইন আর তাতেই এদিক ওদিকের গাড়ি যাচ্ছে আর আসছে। মাত্র দুই বগীর গাড়ি তার ভেতরেই চেকারকে টিকেট কাটতে দেখা যাচ্ছে। ইংলণ্ডে এসে যে এতো ছোট ট্রেন, আর এমন একটা স্টেশন দেখতে পাব ভাবতে পারিনি।

দশ বারো বছরের দুটো ছেলের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। স্কুলের ছেলে। পরণে হাফ প্যান্ট, গায়ে হাল্কা সোয়েটার। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ হলেও ইংলণ্ডে শীত তখন খুব কম নয়। সাইকেল চেপে ছেলে দুটো এলোমেলো ঘুরে ফিরছিল। আমি আলাপ জমাতে শুরু করলাম, কিন্তু ওদের তাতে মন ছিল না—কেবলই দূরে তাকিয়ে যেন কি দেখছিল। জিজ্ঞেস করলাম—ব্যাপার কি'হে? ওরা বলল—ঐ দ্যাখো ; একটা কবুতর। গাছের ডালে বসে আছে।

বসে আছে তাই কি ?

ওকে ধরতে হবে—

ধরে কি করবে ?

বড় ছেলেটা বলল—কুক হিম। রান্না করে ফেলব।

কি করে রান্না করবে ?

জাস্ট বয়েল হিম ইন হট ওয়াটার। গরম জলে সেদ্ধ করে নেবো।

শুধু সেদ্ধ করেই খেতে পারবে ?

ও শিওর, জাস্ট লাইক চিকেন—উইদ্ সল্ট এণ্ড পেপার। নিশ্চয় একটুখানি নুন আর গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে খেয়ে নেবো—সেদ্ধ মুরগীর মতো আর কি !

দুঃখের বিষয়, কবুতরটা তখন হাওয়া হয়ে গেছে।

এবার আমি বড় ছেলেটিকে বললাম—তোমার বাবা কি করেন ?

সঙ্গীকে দেখিয়ে সে বলল—আন এম্প্লয়েড লাইক হিজ-হি ইজ অন ডোল্স্ অর্থাৎ ওর বাবার মতোই বেকার-ভাতা পায়।

ইংলণ্ডে এখন স্ট্রাইক প্রায়ই হয়। আপিস কারখানা বন্ধ থাকলে লোকে কাজ পাবে আর কোথায়। ছেলেদুটোর জন্য মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওদের বেকার বাপ নিশ্চয় ওদের যত্ন নেয় না। পড়াশুনার তদারক করে না। নইলে কি আর ওরা এমন করে ঘুরে বেড়ায়।

কুক-কান্ট্রি দেখতে আমরা প্রথমে গিয়েছিলাম গ্রেট আইটনে। মিড্ল্স্বরোর চল্লিশ মাইল দূরে। বাস-ভাড়া লাগল মোটে বারো টাকা। ভাগ্যিস জার্মানীর মতো নয়—ব্রিমেনে তো ট্রামের ছয় স্টপে লেগেছিল সাড়ে বারোটাকা।

জেম্স্ কুক জন্মেছিলেন এক গণ্ড গাঁয়ে ; নাম তার মার্টন। আট বছর বয়সে জেমস্ বাবার সঙ্গে চলে গিয়েছিলেন গ্রেট আইটনে। সেখানে এক তালুকদারের খামারে তার বাবা শ্রমিকের কাজ করতেন। গ্রেট আইটনের ইস্কুলে বালক জেম্স্ পড়তেন সেটি আজও আছে—রংচং আর মেরামত করে তার ক্লাশের ছোট্ট ঘরটি রেখে দেওয়া হয়েছে। সামনেকার রাস্তাটি পর্যন্ত অবিকল রয়েছে—শুধু কংক্রিটে

গাঁথা পড়েছে, এই যা! দরিদ্র জেম্স্ এই রাস্তা হেঁটে ইস্কুলে আসতেন আড়াইশ বছর আগে। হয়তো আসা-যাওয়ার পথে ছোট নদী লেভেনের জলে তাকিয়ে দেখতেন, হাঁসেরা প্যাঁক প্যাঁক করে খাবার খুঁজে ফিরছে। রাস্তার পাশে সেই লেভেন নদী আজও বয়ে চলেছে। আজও পথিকেরা তাকিয়ে তাদের গ্যাখে।

গ্রেট আইটন তখন ছিল অজ পাড়া-গাঁ—কাঁচা রাস্তা, গরিবের বাড়িঘর, ঝোপঝাড় নিয়ে বাংলার গ্রামের মতই। ইস্কুলের আধমাইল দূরে ছিল কুকদের বাড়ি। সেখানে এখন একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করে রাখা হয়েছে—ঘরগুলো নিয়ে তোলা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণে। অস্ট্রেলিয়া তো ক্যাপটেন কুকই আবিষ্কার করেছিলেন।

গ্রেট আইটনের পনেরো মাইল দূরে হুইটবি তখন মোটামুটি বড় বন্দর। ইস্কুলে পড়া কালে জেম্স্ একদিন পালিয়ে গেলেন হুইটবিতে; হুইটবির এক মুদিখানায় তেলনুন আটা ময়দা মাপার চাকুরি জুটিয়ে নিলেন।

হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মানী থেকে জাহাজ এসে তখন হুইটবিতে ভেড়ে। হরেক রকম মাল আনানেওয়া করে। জাহাজী মানুষ জেম্স্ কুককে টানলেন, জেম্স্ তাদের জাহাজে আনাগোনা শুরু করলেন—দেশ বিদেশের গল্প শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তারপর মুদিদোকান ছাড়লেন, রাতারাতি জাহাজের কাজে গিয়ে যোগ দিলেন—গ্যালী-বয় অর্থাৎ কুকদের সঙ্গে খানসামার কাজ করতে লাগলেন।

শুরু হল জেম্স্ কুকের জাহাজী জীবন—সে যুগে বড় কষ্টের জীবন। কাঠের তৈরী ছোট জাহাজ আজকের মতো সুখসুবিধা তাতে কিছুই ছিল না। কঠিন পরিশ্রমের কাজ, গরিবী খাদ্যখাওয়া—খাও, কাজ কর। সামান্য অপরাধ করেছ কি ব্যাস, বেতের ঘা সইতে হবে।

এই কঠিন অবস্থায় কাজ করেও জেম্স্ কুক নিজে নিজে পড়াশুনা সুরু করে দিলেন। তারপর একদিন জাহাজী পরীক্ষায় পাশ করে নাবিক থেকে হলেন অফিসার। শেষপর্যন্ত ১৭৫৭ সালে কাপ্তেনের

পরীক্ষায় পাশ করলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র উনত্রিশ বছর। ১৭২৮ সালের ১৭ই অক্টোবর তাঁর জন্ম হয়েছিল।

ক্যাপটেন কুক রবার্ট ক্লাইভের সমসাময়িক ছিলেন; দুজনের বয়স ছিল প্রায় একই। ১৭৫৭ সালে ক্লাইভ পলাশীর মাঠে বাংলা দখল করেন। ১৭৫৭ সালে ২৩শে জুন। বৃহস্পতিবারের বিকেলে। সেইদিন থেকে ভারতে ইংরেজ রাজত্ব শুরু হয়ে গেল। ক্লাইভের বাড়ি ছিল কুকদের বাড়ি থেকে একশ মাইল দূরে।

কুকের তখন দারুণ নাম ডাক। ইংলণ্ডের রয়াল নেভি তাঁকে ডেকে নিয়ে কাজ দিলেন। খুব বড় একটি পদে তাঁকে নিয়োগ করা হল—পৃথিবীর সবচাইতে নামকরা সমুদ্র অভিযানের তিনি হলেন নায়ক।

ক্যাপটেন কুক জাহাজ নিয়ে রওনা হলেন প্রশান্ত মহাসাগরের তাইহিতি দ্বীপের দিকে—সঙ্গে জন কয়েক জ্যোতির্বিজ্ঞানী, উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, শিল্পী এবং লেখক তো বটেই। বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যাবার কারণ ছিল—তাইহিতির কাছেই সূর্য আর শুক্রগ্রহ তখন মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। কুকের জাহাজ সেখানে পৌছালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সূর্য আর শুক্রের পর্যবেক্ষণ সারলেন। কিন্তু কুকের কাজ এখানেই শেষ হল না। রয়াল এডমিরাল্টির নির্দেশে এবার তিনি প্রশান্ত মহাসাগরে খুঁজতে লাগলেন একটি মহাদেশ তাঁকে বলাই হয়েছিল ঐদিকে খুব বড় একটা স্থলভাগ না থেকেই যায় না। ঘুরতে ঘুরতে এই অভিযানেই ক্যাপটেন কুক নিউজিল্যাণ্ড আবিষ্কার করলেন, তারপর উত্তরে এগিয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় মজার জিনিস যা কিছু চোখে পড়ল, শিল্পীরা তার ছবি এঁকে নিলেন, লেখকেরা সব বিবরণ লিখলেন।

কুকের জাহাজের নাম ছিল এনডেভর, কাঠের জাহাজ। লম্বায় একশ ছয় ফুট। পাশে উনত্রিশ ফুট—তার মালবহনের ক্ষমতা ছিল তিনশ ছিয়াশী টন। এনডেভর চলত পাল খাটিয়ে। ঘণ্টায় ছ মাইল বেগে। আমাদের রাজহংস কিন্তু পাঁচশ ফুট লম্বা, ষাট ফুট চওড়া—মালবাহনের ক্ষমতা বারো হাজার টন। তাছাড়া রাজহংস চলে এঞ্জিনের জোরে। ঘণ্টায় পনেরো ষোল মাইল বেগে।

ক্যাপটেন কুকের অভিযান শুরু হয়েছিল ১৭৬৮ সালের ২৬শে আগস্ট। ইংলণ্ডের প্লিমাউথ থেকে! দেশে ফিরেছিলেন তিনি তিন বছর পর, ১৭৭১ সালের ১২ই জুন। রওনা হবার সময় জাহাজের লগ বইয়ে তিনি লিখেছিলেন—বেলা দুটোয় পাল খাটানো হল। নাবিক, ভদ্রলোক, তাদের চাকর খানসামা এবং আঠারো মাসের খাদ্য আর যাবতীয় জিনিস নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হল।

পৃথিবীতে রোজ পঞ্চাশ হাজার ঝড় সৃষ্টি হয়। তার বেশির ভাগই সমুদ্রে। কিন্তু এখন তো বৈজ্ঞানিক যুগ ঝড়ের কথা আমরা আগে জানতে পারি, ঝড় থেকে দূরে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে দিব্যি রক্ষা পেতে পারি। ঝড়ের মুখে পালে চলা কাঠের জাহাজগুলোর কথা আমরা ভাবতেও পারি না।

কুক দ্বিতীয় অভিযানে বের হন ১৭৭৩ সালে। জুন মাসের তেরো তারিখে। এবার তিনি দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত চলে যান, একেবারে কুমেরু সাগরে। ১৭৭৪ সালের ৩০শে জানুয়ারী তিনি লগ বইতে লেখেন—কোন মানুষের পক্ষে যতদূর যাওয়া সম্ভব আমি তার চেয়ে বেশি দূরই গিয়েছি···৯৭টি বরফের পাহাড় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। অনেকগুলো খুবই বড়, অবিকল পর্বত চূড়ার মতো ···

১৭৭৬ সালে ক্যাপটেন কুক গিয়ে উঠলেন হাওয়াই দ্বীপে। সেখানকার কিছু বর্বর লোক তাঁকে হত্যা করে মৃতদেহটি শত শত টুকরায় কেটে ফেলল। সেদিন ছিল ১৭৭৯ সালের ১৪ই ডিসেম্বর —কুকের বয়স তখন একান্ন বছর। মাত্র দিন কয়েক পর তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। কিন্তু কারও কথা কেউ আর জানতে পারেন না।

এবার আমরা গ্রেট আইটনের পনের মাইল দূরে মার্টন গ্রামে এসেছি। কুকের জন্মস্থানে। মার্টনে এখন খুব বড় একটি মিউজিয়াম তৈরী হয়েছে। নাম তার কুক মিউজিয়াম। ক্যাপটেন কুকের ইউনিফরম, তাঁর তরবারি, সমুদ্রের কিছু সেকেলে চার্ট, গমের খড়ে ছাওয়া কুকদের ঘরের চাল, সংসারের কিছু বাসনপত্র সবই মিউজিয়ামে রয়েছে। যে ঘরে কুকের জন্ম হয়েছিল, তার ভিটায় একটি স্মৃতিস্তম্ভ

তৈরী হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, হাওয়াই দ্বীপের মানুষ, পশুপাখির মূর্তি এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের হাতে আঁকা ছবি মিউজিয়ামে দেখে তখনকার কথা খানিকটা আঁচ করা যায়। আদি মার্টিন গাঁয়ের কয়েক হাজার জমি জুড়ে এখন কুক-মিউজিয়াম।

পার্কের এপাশে সড়কের ধার বরাবর এখন অনেক বাড়িঘর তৈরী হয়েছে। জমিগুলো সেখানে কিছু উঁচু। কিন্তু তারপরই আবার ঢালু হয়ে গিয়েছে। ওরা বলে হিল্‌স্ এণ্ড ডেল্‌স্। গ্রেট আইটন থেকে মার্টন পেরিয়েও অনেক হিল্‌স্ এণ্ড ডেল্‌স্—সেখানে গরু ভেড়া চড়তে দেখে কি ভালই লেগেছিল। আমার কিন্তু মনে পড়েছিল কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কথা। কাম্বার ল্যাণ্ডের হিল্‌স্ এণ্ড ডেল্‌স্ অর্থাৎ পাহাড় আর উপত্যকা ছিল তাঁর বড় প্রিয়।

কুক-মিউজিয়ামে সবচাইতে চিত্তাকর্ষক বস্তু কি দেখলেন? এই প্রশ্ন করলে আমি বলব—একখানা বই, আলিভার গোল্ড স্মিথের কাব্যগ্রন্থ। তাতে লেখা আছে—'লণ্ডন, ১৮০৪' এবং নিচে একটি নাম দস্তখত—"এলিজা কুক"।

এলিজা কুক ছিলেন ক্যাপটেন জেম্‌স্ কুকের স্ত্রী।

—ঃ শেষ ঃ—

এই লেখকের অন্যান্য বই—

সাত সাগর পেরিয়ে
মিসিসিপি উজিয়ে
চেরিফুলের দেশে—কুড়ি বছর আগে, কুড়ি বছর পরে
দেশ-বিদেশ
শান্তিপুর লোক্যাল
অস্ট্রেলিয়ার অন্তরে
মালয় থেকে মালয়েশিয়া
পাঁচ মহাদেশে চলতে চলতে
হিমালয় যখন টানে
আর এক নাগর
গভীর জলের মাছ প্রঃ অঃ
গৃহ প্রবেশের রাতে ঐ
আমরা তখন রাশিয়ায় ঐ

२७९